চিত্রচোর

১

কাচের পেয়ালায় ডালিমের রস লইয়া সত্যবতী ব্যোমকেশের চেয়ারের পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। বলিল, 'নাও, এটুকু খেয়ে ফেল।'

ঘড়ির দিকে তাকাইয়া দেখিলাম বেলা ঠিক চারিটা। সত্যবতীর সময়ের নড়চড় হয় না।

ব্যোমকেশ আরাম-কেদারায় বসিয়া বই পড়িতেছিল, কিছুক্ষণ বিরাগপূর্ণ চক্ষে পেয়ালার পানে চাহিয়া রহিল, তারপর বলিল, 'রোজ রোজ ডালিমের রস খাব কেন?'

সত্যবতী বলিল, 'ডাক্তারের হুকুম।'

ব্যোমকেশ ভ্রূকুটিকুটিল মুখভঙ্গী করিয়া বলিল, 'ডাক্তারের নিকুচি করেছে। ও খেতে আমার ভাল লাগে না। কি হবে খেয়ে?'

সত্যবতী বলিল, 'গায়ে রক্ত হবে। লক্ষ্মীটি, খেয়ে ফেল।'

ব্যোমকেশ চকিতে একবার সত্যবতীর মুখের পানে দৃষ্টিপাত করিল, প্রশ্ন করিল, 'আজ রাত্তিরে কি খেতে দেবে?'

সত্যবতী বলিল, 'মুর্গীর সুরুয়া আর টোস্ট।'

ব্যোমকেশের ভ্রূকুটি গভীর হইল, 'হুঁ, সুরুয়া।—আর মুর্গীটা খাবে কে?'

সত্যবতী মুখ টিপিয়া বলিল, 'ঠাকুরপো।'

আমি তাড়াতাড়ি বলিলাম, 'শুধু ঠাকুরপো নয়, তোমার অর্ধাঙ্গিনীও ভাগ পাবেন।'

ব্যোমকেশ আমার পানে একবার চোখ পাকাইয়া তাকাইল, তারপর বিকৃত মুখে ডালিমের রসটুকু খাইয়া ফেলিল।

কয়েকদিন হইল ব্যোমকেশকে লইয়া সাঁওতাল পরগণার একটি শহরে হাওয়া বদলাইতে আসিয়াছি। কলিকাতায় ব্যোমকেশ হঠাৎ কঠিন রোগে আক্রান্ত হইয়া শয্যাশায়ী হইয়াছিল; দুই মাস যমে-মানুষে টানাটানির পর তাহাকে বাঁচাইয়া তুলিয়াছি। রোগীর সেবা করিয়া সত্যবতী কাঠির মত রোগা হইয়া গিয়াছিল, আমার অবস্থাও কাহিল হইয়াছিল। তাই ডাক্তারের পরামর্শে পৌষের গোড়ার দিকে সাঁওতাল পরগণার প্রাণপ্রদ জলহাওয়ার সন্ধানে বাহির হইয়া পড়িয়াছিলাম। এখানে আসিয়া ফলও মন্ত্রের মত হইয়াছে। আমার ও সত্যবতীর শরীর তো চাঙ্গা হইয়া উঠিয়াছেই, ব্যোমকেশের শরীরেও দ্রুত রক্তসঞ্চার হইতেছে এবং অসম্ভব রকম ক্ষুধাবৃদ্ধি হইয়াছে। দীর্ঘ রোগভোগের পর তাহার স্বভাব অবুঝ বালকের ন্যায় হইয়া গিয়াছে; সে দিবারাত্র খাই-খাই করিতেছে। আমরা দু'জনে অতি কষ্টে তাহাকে সামলাইয়া রাখিয়াছি।

এখানে আসিয়া অবধি মাত্র দুই জন ভদ্রলোকের সহিত পরিচয় হইয়াছে। এক, অধ্যাপক আদিনাথ সোম; তাঁহার বাড়ির নীচের তলাটা আমরা ভাড়া লইয়াছি। দ্বিতীয়, এখানকার স্থানীয় ডাক্তার অশ্বিনী ঘটক। রোগী সঙ্গে লইয়া আসিয়াছি, তাই সর্বাগ্রে ডাক্তারের সহিত পরিচয় করিয়া রাখা প্রয়োজন মনে হইয়াছে।

শহরে আরও অনেকগুলি বাঙালী আছেন কিন্তু কাহারও সহিত এখনও আলাপের সুযোগ হয় নাই। এ কয়দিন বাড়ির বাহির হইতে পারি নাই, নূতন স্থানে আসিয়া গোছগাছ করিয়া বসিতেই দিন কাটিয়া গিয়াছে। আজ প্রথম সুযোগ হইয়াছে; শহরের একটি গণ্যমান্য বাঙালীর বাড়িতে চা-পানের নিমন্ত্রণ আছে। আমরা যদিও এখানে আসিয়া নিজেদের জাহির করিতে চাহি নাই, তবু কাঁঠালী চাঁপার সুগন্ধের মত ব্যোমকেশের আগমন-বার্তা শহরে রাষ্ট্র হইয়া গিয়াছে এবং তাহার ফলে চায়ের নিমন্ত্রণ আসিয়াছে।

ব্যোমকেশকে এত শীঘ্র চায়ের পার্টিতে লইয়া যাইবার ইচ্ছা আমাদের ছিল না; কিন্তু

দীর্ঘকাল ঘরে বন্ধ থাকিয়া সে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে; ডাক্তারও ছাড়পত্র দিয়াছেন। সুতরাং যাওয়াই স্থির হইয়াছে।

আরাম-কেদারায় বসিয়া বই পড়িতে পড়িতে ব্যোমকেশ উসখুস করিতেছিল এবং বারবার ঘড়ির পানে তাকাইতেছিল। আমি জানালার কাছে দাঁড়াইয়া অলসভাবে সিগারেট টানিতেছিলাম; সাঁওতাল পরগণার মনোরম প্রাকৃতিক দৃশ্য আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া লইয়াছিল। এখানে শুষ্কতার সহিত শ্যামলতার, প্রাচুর্যের সহিত রিক্ততার নিবিড় মিলন ঘটিয়াছে; মানুষের সংস্পর্শ এখানকার কঙ্করময় মাটিকে গলিত পঙ্কিল করিয়া তুলিতে পারে নাই।

ব্যোমকেশ হঠাৎ প্রশ্ন করিল, 'রিক্‌শা কখন আসতে বলেছ?'

বলিলাম, 'সাড়ে চারটে।'

ব্যোমকেশ আর একবার ঘড়ির পানে তাকাইয়া পুস্তকের দিকে চোখ নামাইল। বুঝিলাম ঘড়ির কাঁটার মন্থর আবর্তন তাহাকে অধীর করিয়া তুলিয়াছে। হাসিয়া বলিলাম, 'রাই ধৈর্যং রহু ধৈর্যং—।'

ব্যোমকেশ খিঁচাইয়া উঠিল, 'লজ্জা করে না! আমাকে দেখিয়ে দেখিয়ে সিগারেট খাচ্ছ।'

অর্ধদগ্ধ সিগারেট জানালার বাহিরে ফেলিয়া দিলাম। ব্যোমকেশ এখনও সিগারেট খাইবার অনুমতি পায় নাই; সত্যবতী কঠিন দিব্য দিয়াছে—তাহার অনুমতি না পাইয়া সিগারেট খাইলে মাথা খাইবে, মরা মুখ দেখিবে। আমিও ব্যোমকেশের সম্মুখে সিগারেট খাইতাম না; প্রতিজ্ঞাবদ্ধ নেশাখোরকে লোভ দেখানোর মত পাপ আর নাই। কিন্তু মাঝে মাঝে ভুল হইয়া যাইত।

২

ঠিক সাড়ে চারিটার সময় বাড়ির সদরে দুইটি সাইকেল-রিক্‌শা আসিয়া দাঁড়াইল। আমরা প্রস্তুত ছিলাম; সত্যবতীও ইতিমধ্যে সাজপোশাক করিয়া লইয়াছিল। আমরা বাহির হইলাম।

আমাদের বাড়ির একতলার সহিত দোতলার কোনও যোগ ছিল না, সদরের খোলা বারান্দার ওপাশ হইতে উপরের সিঁড়ি উঠিয়া গিয়াছিল। বাড়ির সম্মুখে খানিকটা মুক্ত স্থান, তারপর ফটক। বাড়ি হইতে বাহির হইয়া দেখিলাম আমাদের গৃহস্বামী অধ্যাপক সোম বিরক্তগম্ভীর মুখে ফটকের কাছে দাঁড়াইয়া আছেন।

অধ্যাপক সোমের বয়স বোধ করি চল্লিশের কাছাকাছি, কিন্তু তাঁহাকে দেখিয়া ত্রিশের বেশী বয়স মনে হয় না; তাঁহার আচার-ব্যবহারেও প্রৌঢ়ত্বের ছাপ নাই। সব কাজেই চটপটে উৎসাহশীল। কিন্তু তাঁহার জীবনে একটি কাঁটা ছিল, সেটি তাঁর স্ত্রী! দাম্পত্য জীবনে তিনি সুখী হইতে পারেন নাই।

প্রোফেসর সোম বাহিরে যাইবার উপযোগী সাজগোজ করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন, আমাদের দেখিয়া করুণ হাসিলেন। তিনিও চায়ের নিমন্ত্রণে যাইবেন জানিতাম, তাই জিজ্ঞাসা করিলাম, 'দাঁড়িয়ে যে! যাবেন না?'

প্রোফেসর সোম একবার নিজের বাড়ির দ্বিতলের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, 'যাব। কিন্তু গিন্নীর এখনও প্রসাধন শেষ হয়নি। আপনারা এগোন।'

আমরা রিক্‌শাতে চড়িয়া বসিলাম। ব্যোমকেশ ও সত্যবতী একটাতে বসিল, অন্যটাতে আমি একা। ঘণ্টি বাজাইয়া মনুষ্য-চালিত ত্রিচক্র-যান ছাড়িয়া দিল। ব্যোমকেশের মুখে হাসি ফুটিল। সত্যবতী সযত্নে তাহার গায়ে শাল জড়াইয়া দিল। অতর্কিতে ঠাণ্ডা লাগিয়া না যায়।

কাঁকর-ঢাকা উঁচু-নীচু রাস্তা দিয়া দুই দিক দেখিতে দেখিতে চলিয়াছি। রাস্তার

দু'ধারে ঘরবাড়ির ভিড় নাই, এখানে একটা ওখানে একটা। শহরটি যেন হাত-পা ছড়াইয়া অসমতল পাহাড়তলির উপর অঙ্গ এলাইয়া দিয়াছে, গাদাগাদি ঠেসাঠেসি নাই। আয়তনে বিস্তৃত হইলেও নগরের জনসংখ্যা খুব বেশী নয়। কিন্তু সমৃদ্ধি আছে। আশেপাশে কয়েকটি অভ্রের খনি এখানকার সমৃদ্ধির প্রধান সূত্র। আদালত আছে, ব্যাঙ্ক আছে। এখানকার অধিবাসীদের মধ্যে যাঁরা গণ্যমান্য তাঁরা প্রায় সকলেই বাঙালী।

যিনি আমাদের নিমন্ত্রণ করিয়াছেন তাঁহার নাম মহীধর চৌধুরী। অধ্যাপক সোমের কাছে শুনিয়াছি ভদ্রলোক প্রচুর বিত্তশালী; বয়সে প্রবীণ হইলেও সর্বদাই নানাপ্রকার হুজুগ লইয়া আছেন; অর্থব্যয়ে মুক্তহস্ত। তাঁহার প্রযোজনায় চড়ুইভাতি, শিকার, খেলাধুলা লাগিয়াই আছে।

মিনিট দশ পনেরোর মধ্যে তাঁহার বাসভবনের সম্মুখে উপস্থিত হইলাম। প্রায় দশ বিঘা জমি পাথরের পাঁচিল দিয়া ঘেরা, হঠাৎ দুর্গ বলিয়া ভ্রম হয়। ভিতরে রকমারি গাছপালা, মরসুমী ফুলের কেয়ারি, উঁচু-নীচু পাথুরে জমির উপর কোথাও লাল-মাছের বাঁধানো সরোবর, কোথাও নিভৃত বেতসকুঞ্জ, কোথাও বা কৃত্রিম ক্রীড়াশৈল। সাজানো বাগান দেখিয়া সহসা বনানীর বিভ্রম উপস্থিত হয়। মহীধরবাবু যে ধনবান তাহা তাঁহার বাগান দেখিয়া বুঝিতে কষ্ট হয় না।

বাড়ির সম্মুখে ছাঁটা ঘাসের সমতল টেনিস কোর্ট, তাহার উপর টেবিল চেয়ার প্রভৃতি সাজাইয়া নিমন্ত্রিতদের বসিবার স্থান হইয়াছে, শীতের বৈকালী রৌদ্র স্থানটিকে আতপ্ত করিয়া রাখিয়াছে। সুন্দর দোতলা বাড়িটি যেন এই দৃশ্যের পশ্চাৎপট রচনা করিয়াছে। আমরা উপস্থিত হইলে মহীধরবাবু সাদরে আমাদের অভ্যর্থনা করিলেন। ভদ্রলোকের দেহায়তন বিপুল, গৌরবর্ণ দেহ, মাথায় সাদা চুল ছোট করিয়া ছাঁটা, দাড়িগোঁফ কামানো গাল দু'টি চালতার মত, মুখে ফুটিফাটা হাসি। দেখিলেই মনে হয় অমায়িক ও সরল প্রকৃতির লোক।

তিনি তাঁহার মেয়ে রজনীর সহিত আমাদের পরিচয় করাইয়া দিলেন। মেয়েটির বয়স কুড়ি-একুশ, সুশ্রী গৌরাঙ্গী হাস্যমুখী; ভাসা-ভাসা চোখ দু'টিতে বুদ্ধি ও কৌতুকের খেলা। মহীধরবাবু বিপত্নীক, এই মেয়েটি তাঁহার জীবনের একমাত্র সম্বল এবং উত্তরাধিকারিণী।

রজনী মুহূর্তমধ্যে সত্যবতীর সহিত ভাব করিয়া ফেলিল এবং তাহাকে লইয়া দূরের একটা সোফাতে বসাইয়া গল্প জুড়িয়া দিল। আমরাও বসিলাম। অতিথিরা এখনও সকলে আসিয়া উপস্থিত হন নাই, কেবল ডাক্তার অশ্বিনী ঘটক ও আর একটি ভদ্রলোক আসিয়াছেন। ডাক্তার ঘটক আমাদের পরিচিত, পূর্বেই বলিয়াছি; অন্য ভদ্রলোকটির সহিত আলাপ হইল। এঁর নাম নকুলেশ সরকার; শহরের একজন মধ্যম শ্রেণীর ব্যবসাদার তা ছাড়া ফটোগ্রাফির দোকান আছে। ফটোগ্রাফি করেন শখের জন্য, উপরন্তু এই সূত্রে কিছু-কিঞ্চিৎ উপার্জন হয়। শহরে অন্য ফটোগ্রাফার নাই।

সাধারণভাবে কথাবার্তা হইতে লাগিল। মহীধরবাবু এক সময় ডাক্তার ঘটককে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, 'ওহে ঘোটক, তুমি অ্যাদ্দিনেও ব্যোমকেশবাবুকে চাঙ্গা করে তুলতে পারলে না! তুমি দেখছি নামেও ঘোটক কাজেও ঘোটক—একেবারে ঘোড়ার ডাক্তার!' বলিয়া নিজের রসিকতায় হা-হা করিয়া হাসিতে লাগিলেন।

নকুলেশবাবু ফোড়ন দিয়া বলিলেন, 'ঘোড়ার ডাক্তার না হয়ে উপায় আছে? একে অশ্বিনী তায় ঘোটক।'

ডাক্তার ইঁহাদের চেয়ে বয়সে অনেক ছোট, সে একটু হাসিয়া রসিকতা হজম করিল। ডাক্তারকে লইয়া অনেকেই রঙ্গ-রসিকতা করে দেখিলাম, কিন্তু তাহার চিকিৎসা-বিদ্যা সম্বন্ধে সকলেই শ্রদ্ধাশীল। শহরে আরও কয়েকজন প্রবীণ চিকিৎসক আছেন, কিন্তু এই তরুণ সৎস্বভাব ডাক্তারটি মাত্র তিন বৎসরের মধ্যে বেশ পসার জমাইয়া তুলিয়াছে।

ক্রমে অন্যান্য অতিথিরা আসিতে আরম্ভ করিলেন। প্রথমে আসিলেন সস্ত্রীক সপুত্র

ঊষানাথ ঘোষ। ইনি একজন ডেপুটি, এখানকার সরকারী মালখানার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী। লম্বা-চওড়া চেহারা, খসখসে কালো রঙ, চোখে কালো কাচের চশমা। বয়স আন্দাজ পঁয়ত্রিশ, গম্ভীরভাবে থামিয়া থামিয়া কথা বলেন, গম্ভীরভাবে হাসেন। তাঁহার স্ত্রীর চেহারা রুগ্ন, মুখে উৎকণ্ঠার ভাব, থাকিয়া থাকিয়া স্বামীর মুখের পানে উদ্বিগ্ন চক্ষে দৃষ্টিপাত করেন। ছেলেটি বছর পাঁচেকের; তাহাকে দেখিয়াও মনে হয় যেন সর্বদা শঙ্কিত সঙ্কুচিত হইয়া আছে। ঊষানাথবাবু সম্ভবতঃ নিজের পরিবারবর্গকে কঠিন শাসনে রাখেন, তাঁহার সম্মুখে কেহ মাথা তুলিয়া কথা বলিতে পারে না।

মহীধরবাবু আমাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়া দিলে তিনি গম্ভীর মুখে গলার মধ্যে দুই চারিটি শব্দ উচ্চারণ করিলেন; বোধ হয় তাহা লৌকিক সম্ভাষণ, কিন্তু আমরা কিছু শুনিতে পাইলাম না। তাঁহার চক্ষু দুইটি কালো কাচের অন্তরালে অদৃশ্য হইয়া রহিল। একটু অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিলাম। যাহার চোখ দেখিতে পাইতেছি না এমন লোকের সঙ্গে কথা কহিয়া সুখ নাই।

তারপর আসিলেন পুলিসের ডি.এস.পি পুরন্দর পাণ্ডে। ইনি বাঙালী নন, কিন্তু পরিষ্কার বাংলা বলেন; বাঙালীর সহিত মেলামেশা করিতেও ভালবাসেন। লোকটি সুপুরুষ, পুলিসের সাজ-পোশাকে দিব্য মানাইয়াছে। ব্যোমকেশের হাত ধরিয়া মৃদুহাস্যে বলিলেন, 'আপনি এসেছেন, কিন্তু এমনি আমাদের দুর্ভাগ্য একটি জটিল রহস্য দিয়ে যে আপনাকে সংবর্ধনা করব তার উপায় নেই। আমাদের এলাকায় রহস্য জিনিসটার একান্ত অভাব। সব খোলাখুলি। চুরি বাটপাড়ি যে হয় না তা নয়, কিন্তু তাতে বুদ্ধি খেলাবার অবকাশ নেই।'

ব্যোমকেশও হাসিয়া বলিল, 'সেটা আমার পক্ষে ভালই। জটিল রহস্য এবং আরও অনেক লোভনীয় বস্তু থেকে আমি উপস্থিত বঞ্চিত। ডাক্তারের বারণ।'

এই সময় আর একজন অতিথি দেখা দিলেন। ইনি স্থানীয় ব্যাঙ্কের ম্যানেজার অমরেশ রাহা। কৃশ ব্যক্তিত্বহীন চেহারা, তাই বোধ করি মুখে ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি রাখিয়া চেহারায় একটু বৈশিষ্ট্য দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। বয়স যৌবন ও প্রৌঢ়ত্বের মাঝামাঝি একটা অনির্দিষ্ট স্থানে।

মহীধরবাবু বলিলেন, 'অমরেশবাবু, আপনি ব্যোমকেশবাবুকে দেখবার জন্যে ব্যস্ত হয়েছিলেন—এই নিন।'

অমরেশবাবু নমস্কার করিয়া সহাস্যে বলিলেন, 'কীর্তিমান পুরুষকে দেখবার ইচ্ছা কার না হয়? আপনারাও কম ব্যস্ত হননি, শুধু আমাকে দোষ দিলে চলবে কেন?'

মহীধরবাবু বলিলেন, 'কিন্তু আজ আসতে বড় দেরী করেছেন। সকলেই এসে গেছেন, কেবল প্রোফেসর সোম বাকি। তা তাঁর না হয় একটা ওজুহাত আছে। মেয়েদের সাজসজ্জা করতে একটু দেরী হয়। আপনার সে ওজুহাতও নেই। ব্যাঙ্ক তো সাড়ে তিনটের সময় বন্ধ হয়ে গেছে।'

অমরেশ রাহা বলিলেন, 'তাড়াতাড়ি আসব ভেবেছিলাম। কিন্তু বড়দিন এসে পড়ল, এখন কাজের চাপ একটু বেশী। বছর ফুরিয়ে আসছে। নূতন বছর পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই তো আপনারা ব্যাঙ্ক থেকে টাকা আনতে আরম্ভ করবেন। তার ব্যবস্থা করে রাখতে হবে তো।'

ইতিমধ্যে কয়েকজন ভৃত্য বাড়ির ভিতর হইতে বড় বড় ট্রেতে করিয়া নানাবিধ খাদ্য-পানীয় আনিয়া টেবিলগুলির উপর রাখিতেছিল; চা, কেক্, সন্দেশ, পাঁপরভাজা, ডালমুট ইত্যাদি। রজনী উঠিয়া গিয়া খাবারের প্লেটগুলি পরিবেশন করিতে লাগিল। কেহ কেহ নিজেই গিয়া প্লেট তুলিয়া লইয়া আহার আরম্ভ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে হাসি গল্প আলাপ-আলোচনা চলিল।

রজনী মিষ্টান্নের একটি প্লেট লইয়া ব্যোমকেশের সম্মুখে দাঁড়াইল, হাসিমুখে বলিল, 'ব্যোমকেশবাবু, একটু জলযোগ।'

ব্যোমকেশ আড়চোখে একবার সত্যবতীর দিকে তাকাইল, দেখিল সত্যবতী দূর হইতে

একদৃষ্টে তাহার পানে চাহিয়া আছে। ব্যোমকেশ ঘাড় চুলকাইয়া বলিল, 'আমাকে মাপ করতে হবে। এসব আমার চলবে না।'

মহীধরবাবু ঘুরিয়া ফিরিয়া খাওয়া তদারক করিতেছিলেন, বলিলেন, 'সে কি কথা! একেবারেই চলবে না? একটু কিছু—? ওহে ডাক্তার, তোমার রোগীর কি কিছুই খাবার হুকুম নেই?'

ডাক্তার টেবিলের নিকট দাঁড়াইয়া এক মুঠি ডালমুট মুখে ফেলিয়া চিবাইতেছিল, বলিল, 'না খেলেই ভাল।'

ব্যোমকেশ ক্লিষ্ট হাসিয়া বলিল, 'শুনলেন তো! আমাকে শুধু এক পেয়ালা চা দিন। ভাববেন না, আবার আমরা আসব; আজকের আসাটা মুখবন্ধ মাত্র।'

মহীধরবাবু খুশী হইয়া বলিলেন, 'আমার বাড়িতে রোজ সন্ধ্যেবেলা কেউ না কেউ পায়ের ধুলো দেন। আপনারাও যদি মাঝে মাঝে আসেন সান্ধ্য-বৈঠক জমবে ভাল।'

এতক্ষণে অধ্যাপক সোম সস্ত্রীক আসিয়া পৌঁছিলেন। সোমের একটু লজ্জা-লজ্জা ভাব। বস্তুত লজ্জা না হওয়াই আশ্চর্য। সোম-পত্নী মালতী দেবীর বর্ণনা আমরা এখনও দিই নাই, কিন্তু আর না দিলে নয়। বয়সে তিনি স্বামীর প্রায় সমকক্ষ; কালো মোটা শরীর, থলথলে গড়ন, ভাঁটার মত চক্ষু সর্বদাই গর্বিতভাবে ঘুরিতেছে; মুখশ্রী দেখিয়া কেহ মুগ্ধ হইবে সে সম্ভাবনা নাই। উপরন্তু তিনি সাজ-পোশাক করিয়া থাকিতে ভালবাসেন। আজ যেরূপ সর্বালঙ্কার ভূষিতা হইয়া চায়ের জলসায় আসিয়াছেন তাহাতে ইন্দ্রপুরীর অপ্সরা-দেরও চমক লাগিবার কথা। পরিধানে ডগ্‌ডগে লাল মাদ্রাজী সিল্কের শাড়ী, তার উপর সর্বাঙ্গে হীরা-জহরতের গহনা। তাঁহার পাশে সোমের কুণ্ঠিত ম্রিয়মাণ মূর্তি দেখিয়া আমাদেরই লজ্জা করিতে লাগিল।

রজনী তাড়াতাড়ি গিয়া তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিল, কিন্তু মালতী দেবীর মুখে হাসি ফুটিল না। তিনি বক্রচক্ষে রজনীর মুখ হইতে স্বামীর মুখ পর্যন্ত দৃষ্টির একটি কশাঘাত করিয়া চেয়ারে গিয়া বসিলেন।

খাওয়া এবং গল্প চলিতে লাগিল। ব্যোমকেশ মুখে শহীদের ন্যায় ভাবব্যঞ্জনা ফুটাইয়া চুমুক দিয়া দিয়া চা খাইতেছে; আমি নকুলেশবাবুর সহিত আলাপ করিতে করিতে পানাহার করিতেছি; উষানাথবাবু গম্ভীরমুখে পুরন্দর পাণ্ডের কথা শুনিতে শুনিতে ঘাড় নাড়িতে-ছেন; তাঁহার ছেলেটি লুব্ধভাবে খাবারের টেবিলের দিকে অগ্রসর হইয়া শঙ্কিত-মুখে আবার ফিরিয়া আসিতেছে; তাহার মা খাবারের একটি প্লেট হাতে ধরিয়া পর্যায়ক্রমে ছেলে ও স্বামীর দিকে উদ্বিগ্ন দৃষ্টিপাত করিতেছেন।

এই সময় বাক্যালাপের মিলিত কলস্বরের মধ্যে মহীধরবাবুর ঈষদুচ্চ কণ্ঠ শোনা গেল 'মিস্টার পাণ্ডে খানিক আগে বলছিলেন যে আমাদের এলাকায় জটিল রহস্যের একান্ত অভাব। এ কথা কতদূর সত্য আপনারাই বিচার করুন। কাল রাত্রে আমার বাড়িতে চোর ঢুকেছিল।'

স্বরগুঞ্জন নীরব হইল; সকলের দৃষ্টি গিয়া পড়িল মহীধরবাবুর উপর। তিনি হাস্যবিকশিত মুখে দাঁড়াইয়া আছেন, যেন সংবাদটা ভারি কৌতুকপ্রদ।

অমরেশবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কিছু চুরি গেছে নাকি?'

মহীধরবাবু বলিলেন, 'সেইটেই জটিল রহস্য। ড্রয়িংরুমের দেয়াল থেকে একটা বাঁধানো ফটোগ্রাফ চুরি গেছে। রাত্রে কিছু জানতে পারিনি, সকালবেলা দেখলাম ছবি নেই; আর একটা জানালা খোলা রয়েছে।'

পুরন্দর পাণ্ডে তাঁহার পাশে আসিয়া দাঁড়াইলেন, বলিলেন, 'ছবি! কোন্ ছবি?'

'একটা গ্রুপ-ফটোগ্রাফ। মাসখানেক আগে আমরা পিক্‌নিকে গিয়েছিলাম, সেই সময় নকুলেশবাবু তুলেছিলেন।'

পাণ্ডে বলিলেন, 'হুঁ। আর কিছু চুরি করেনি? ঘরে দামী জিনিস কিছু ছিল?'

মহীধরবাবু বলিলেন, 'কয়েকটা রূপোর ফুলদানী ছিল; তা ছাড়া পাশের ঘরে অনেক

রূপোর বাসন ছিল। চোর এসব কিছু না নিয়ে স্রেফ একটি ফটো নিয়ে পালাল। বলুন দেখি জটিল রহস্য কি না?'

পাণ্ডে তাচ্ছিল্যভরে হাসিয়া বলিলেন, 'জটিল রহস্য মনে করতে চান মনে করতে পারেন। আমার তো মনে হয় কোনও জংলী সাঁওতাল জানালা খোলা পেয়ে ঢুকেছিল, তারপর ছবির সোনালী ফ্রেমের লোভে ছবিটা নিয়ে গেছে।'

মহীধরবাবু ব্যোমকেশের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, 'ব্যোমকেশবাবু, আপনার কি মনে হয়?'

ব্যোমকেশ এতক্ষণ ইহাদের সওয়াল জবাব শুনিতেছিল বটে, কিন্তু তাহার চক্ষু অলস-ভাবে চারিদিকে ঘুরিতেছিল, সে এখন একটু সচেতন হইয়া বলিল, 'মিস্টার পাণ্ডে ঠিকই ধরেছেন মনে হয়। নকুলেশবাবু, আপনি ছবি তুলেছিলেন?'

নকুলেশবাবু বলিলেন, 'হ্যাঁ। ছবিখানা ভাল হয়েছিল। তিন কপি ছেপেছিলাম। তার মধ্যে এক কপি মহীধরবাবু নিয়েছিলেন—'

ঊষানাথবাবু গলা ঝাড়া দিয়া বলিলেন, 'আমিও একখানা কিনেছিলাম।'

ব্যোমকেশ জিজ্ঞাসা করিল, 'আপনার ছবিখানা আছে তো?'

ঊষানাথবাবু বলিলেন, 'কি জানি। এল্‌বামে রেখেছিলাম, তারপর আর দেখিনি। আছে নিশ্চয়।'

'আর তৃতীয় ছবিটি কে নিয়েছিলেন নকুলেশবাবু?'

'প্রোফেসর সোম।'

আমরা সকলে সোমের পানে তাকাইলাম। তিনি এতক্ষণ নির্জীব ভাবে স্ত্রীর পাশে বসিয়াছিলেন, নিজের নাম উচ্চারিত হইতে শুনিয়া চমকিয়া উঠিলেন; তাঁহার মুখ ধীরে ধীরে লাল হইয়া উঠিতে লাগিল। সোম-গৃহিণীর কিন্তু কোন প্রকার ভাবান্তর দেখা গেল না; তিনি কষ্টিপাথরের যক্ষিণীমূর্তির ন্যায় অটল হইয়া বসিয়া রহিলেন।

ব্যোমকেশ বলিল, 'আপনার ছবিটা নিশ্চয় আছে!'

সোম উত্তপ্তমুখে বলিলেন, 'অ্যাঁ—তা—বোধ হয়—ঠিক বলতে পারি না—'

তাঁহার ভাব দেখিয়া একটু বিস্মিত হইলাম। এমন কিছু গুরুতর বিষয় নয়, তিনি এমন অসম্বৃত হইয়া পড়িলেন কেন?

তাঁহাকে সঙ্কটাবস্থা হইতে উদ্ধার করিলেন অমরেশবাবু, হাসিয়া বলিলেন, 'তা গিয়ে থাকে যাক গে, আর একখানা নেবেন। নকুলেশবাবু, আমারও কিন্তু একখানা চাই। আমিও গ্রুপে ছিলাম।'

নকুলেশবাবু মাথা চুলকাইয়া বলিলেন, 'ও ছবিটা আর পাওয়া যাবে না। নেগেটিভও খুঁজে পাচ্ছি না।'

'সে কি! কোথায় গেল নেগেটিভ?'

দেখিলাম, ব্যোমকেশ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে নকুলেশবাবুর পানে চাহিয়া আছে। তিনি বলিলেন, 'আমার স্টুডিওতে অন্যান্য নেগেটিভের সঙ্গে ছিল। আমি দিন দুয়েকের জন্যে কলকাতা গিয়েছিলাম, স্টুডিও বন্ধ ছিল; ফিরে এসে আর সেটা খুঁজে পাচ্ছি না।'

পাণ্ডে বলিলেন, 'ভাল করে খুঁজে দেখবেন। নিশ্চয়ই কোথাও আছে, যাবে কোথায়!

এ প্রসঙ্গ লইয়া আর কোনও কথা হইল না। এদিকে সন্ধ্যার ছায়া ধীরে ধীরে ঘনাইয়া আসিতেছিল। আমরা গাত্রোত্থানের উদ্যোগ করিলাম, কারণ সূর্যাস্তের পর ব্যোমকেশকে বাহিরে রাখা নিরাপদ নয়।

এই সময় দেখিলাম একটি প্রেতাকৃতি লোক কখন আসিয়া মহীধরবাবুর পাশে দাঁড়াইয়াছে এবং নিম্নস্বরে তাঁহার সহিত কথা কহিতেছে। লোকটি যে নিমন্ত্রিত অতিথি নয় তাহা তাহার বেশবাস দেখিয়াই অনুমান করা যায়। দীর্ঘ কঙ্কালসার দেহে আধ-ময়লা ধুতি ও সুতির কামিজ, চক্ষু এবং গণ্ডস্থল কোটরপ্রবিষ্ট, যেন মূর্তিমান দুর্ভিক্ষ। তবু লোকটি যে ভদ্রশ্রেণীর তাহা বোঝা যায়।

মহীধরবাবু আমার অনতিদূরে উপবিষ্ট ছিলেন, তাই তাঁহাদের কথাবার্তা কানে আসিল। মহীধরবাবু একটু অপ্রসন্ন স্বরে বলিলেন, 'আবার কি চাই বাপু? এই তো পরশু তোমাকে টাকা দিয়েছি।'

লোকটি ব্যগ্র-বিহ্বল স্বরে বলিল, 'আজ্ঞে, আমি টাকা চাই না। আপনার একটা ছবি এঁকেছি, তাই দেখাতে এনেছিলাম।'

'আমার ছবি!'

লোকটির হাতে এক তা পাকানো কাগজ ছিল, সে তাহা খুলিয়া মহীধরবাবুর চোখের সামনে ধরিল।

মহীধরবাবু সবিস্ময়ে ছবির পানে চাহিয়া রহিলেন। আমারও কৌতূহল হইয়াছিল, উঠিয়া গিয়া মহীধরবাবুর চেয়ারের পিছনে দাঁড়াইলাম।

ছবি দেখিয়া অবাক হইয়া গেলাম। সাদা কাগজের উপর ক্রেয়নের আঁকা ছবি, মহীধর-বাবুর বুক পর্যন্ত প্রতিকৃতি; পাকা হাতের নিঃসংশয় কয়েকটি রেখায় মহীধরবাবুর অবিকল চেহারা ফুটিয়া উঠিয়াছে।

আমার দেখাদেখি রজনীও আসিয়া পিতার পিছনে দাঁড়াইল এবং ছবি দেখিয়া সহর্ষে বলিয়া উঠিল, 'বাঃ! কি সুন্দর ছবি!'

তখন আরও কয়েকজন আসিয়া জুটিলেন। ছবিখানা হাতে হাতে ঘুরিতে লাগিল এবং সকলের মুখেই প্রশংসা গুঞ্জরিত হইয়া উঠিল। দুর্ভিক্ষপীড়িত চিত্রকর অদূরে দাঁড়াইয়া গদ্‌গদ মুখে দুই হাত ঘষিতে লাগিল।

মহীধরবাবু তাহাকে বলিলেন, 'তুমি তো খাসা ছবি আঁকতে পার। তোমার নাম কি?'

চিত্রকর বলিল, 'আজ্ঞে, আমার নাম ফাল্গুনী পাল।'

মহীধরবাবু পকেট হইতে একটি দশ টাকার নোট বাহির করিয়া প্রসন্ন স্বরে বলিলেন, 'বেশ বেশ। ছবিখানি আমি নিলাম। এই নাও তোমার পুরস্কার।'

ফাল্গুনী পাল কাঁকড়ার মত হাত বাড়াইয়া তৎক্ষণাৎ নোট পকেটস্থ করিল।

পুরন্দর পাণ্ডে ললাট কুঞ্চিত করিয়া ছবিখানা দেখিতেছিলেন, হঠাৎ মুখ তুলিয়া ফাল্গুনীকে প্রশ্ন করিলেন, 'তুমি ওঁর ছবি আঁকলে কি করে? ফটো থেকে?'

ফাল্গুনী বলিল, 'আজ্ঞে, না। ওঁকে পরশুদিন একবার দেখেছিলাম—তাই—'

'একবার দেখেছিলে তাতেই ছবি এঁকে ফেললে?'

ফাল্গুনী আমতা আমতা করিয়া বলিল, 'আজ্ঞে, আমি পারি। আপনি যদি হুকুম দেন আপনার ছবি এঁকে দেব।'

পাণ্ডে ক্ষণেক নীরব থাকিয়া বলিলেন, 'আচ্ছা, বেশ। তুমি যদি আমার ছবি এঁকে আনতে পার, আমিও তোমাকে দশ টাকা বক্‌শিস দেব।'

ফাল্গুনী পাল সবিনয়ে সকলকে নমস্কার করিয়া চলিয়া গেল। পাণ্ডে ব্যোমকেশের দিকে চাহিয়া বলিলেন, 'দেখা যাক। আমি ওঁদের পিক্‌নিক গ্রুপে ছিলাম না।'

ব্যোমকেশ অনুমোদনসূচক ঘাড় নাড়িল।

অতঃপর সভা ভঙ্গ হইল। মহীধরবাবুর মোটর আমাদের বাড়ি পৌঁছাইয়া দিল। সোম-দম্পতিও আমাদের সঙ্গে ফিরিলেন।

৩

রাত্রি আন্দাজ আটটার সময় আমরা তিনজন বসিবার ঘরে দোরতাড়া বন্ধ করিয়া বসিয়াছিলাম। নৈশ আহারের এখনও বিলম্ব আছে, ব্যোমকেশ আরাম-কেদারায় বসিয়া বলবর্ধক ডাক্তারি মদ্য চুমুক দিয়া পান করিতেছে; সত্যবতী তাহার পাশে একটা চেয়ারে র‍্যাপার মুড়ি দিয়া বসিয়াছে। আমি সম্মুখে বসিয়া মাঝে মাঝে পকেট হইতে সিগারেটের

ডিবা বাহির করিতেছি, আবার রাখিয়া দিতেছি। ব্যোমকেশের গঞ্জনা খাইবার আর ইচ্ছা নাই। চায়ের জলসার আলোচনাই হইতেছে।

আমি বলিলাম, 'আমরা শিল্প-সাহিত্যের কত আদর করি ফাল্গুনী পাল তার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। লোকটা সত্যিকার গুণী, অথচ পেটের দায়ে ভিক্ষে করে বেড়াচ্ছে।'

ব্যোমকেশ একটু অন্যমনস্ক ছিল, বলিল, 'পেটের দায়ে ভিক্ষে করছে তুমি জানলে কি করে?'

বলিলাম, 'ওর চেহারা আর কাপড়-চোপড় দেখে পেটের অবস্থা আন্দাজ করা শক্ত নয়।'

ব্যোমকেশ একটু হাসিল, 'শক্ত নয় বলেই তুমি ভুল আন্দাজ করেছ। তুমি সাহিত্যিক, শিল্পীর প্রতি তোমার সহানুভূতি স্বাভাবিক। কিন্তু ফাল্গুনী পালের শারীরিক দুর্গতির কারণ অন্নাভাব নয়। আসলে খাদ্যের চেয়ে পানীয়ের প্রতি তার টান বেশী।'

'অর্থাৎ মাতাল? তুমি কি করে বুঝলে?'

'প্রথমত, তার ঠোঁট দেখে। মাতালের ঠোঁট যদি লক্ষ্য কর, দেখবে বৈশিষ্ট্য আছে; একটু ভিজে ভিজে, একটু শিথিল—ঠিক বোঝাতে পারব না, কিন্তু দেখলে বুঝতে পারি। দ্বিতীয়ত, ফাল্গুনী যদি ক্ষুধার্ত হত তাহলে খাদ্যদ্রব্যগুলোর প্রতি লোলুপ দৃষ্টিপাত করত, টেবিলের উপর তখনও প্রচুর খাবার ছিল। কিন্তু ফাল্গুনী সেদিকে একবার ফিরেও তাকাল না। তৃতীয়ত, আমার পাশ দিয়ে যখন চলে গেল তখন তার গায়ে মদের গন্ধ পেলাম। খুব স্পষ্ট নয়, তবু মদের গন্ধ।' বলিয়া ব্যোমকেশ নিজের বলবর্ধক ঔষধটি তুলিয়া লইয়া এক চুমুক পান করিল।

সত্যবতী বলিল, 'যাক গে, মাতালের কথা শুনতে ভাল লাগে না। কিন্তু ছবি চুরির এ কি ব্যাপার গা? আমি তো কিছু বুঝতেই পারলাম না। মিছিমিছি ছবি চুরি করবে কেন?'

ব্যোমকেশ কতকটা আপন মনেই বলিল, 'হয়তো পাণ্ডেসাহেব ঠিকই ধরেছেন। কিন্তু—। যদি তা না হয় তাহলে ভাববার কথা।...পিক্‌নিকে গ্রুপ ছবি তোলা হয়েছিল। আজ চায়ের পার্টিতে যাঁরা এসেছিলেন তাঁরা সকলেই পিক্‌নিকে ছিলেন—পাণ্ডে ছাড়া।...ছবির তিনটে কপি ছাপা হয়েছিল; তার মধ্যে একটা চুরি গেছে, বাকি দুটো আছে কিনা জানা যায়নি —নেগেটিভটাও পাওয়া যাচ্ছে না।—' একটু চুপ করিয়া থাকিয়া হঠাৎ ছাদের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলিল, 'ইনি ছবির কথায় এমন ঘাবড়ে গেলেন কেন বোঝা গেল না।'

কিছুক্ষণ নীরবে কাটিবার পর আমি বলিলাম, 'কেউ যদি একটা বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে ছবিটা সরিয়ে থাকে তবে সে উদ্দেশ্যটা কি হতে পারে?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'উদ্দেশ্য কি একটা অজিত? কে কোন্ মতলবে ফিরছে তা কি এত সহজে ধরা যায়? গহনা কর্মণো গতিঃ। সেদিন একটা মার্কিন পত্রিকায় দেখেছিলাম, ওদের চিড়িয়াখানাতে এক বানর-দম্পতি আছে। পুরুষ বাঁদরটা এমনি হিংসুটে, কোনও পুরুষ-দর্শক খাঁচার কাছে এলেই বৌকে টেনে নিয়ে গিয়ে লুকিয়ে রাখে।'

সত্যবতী খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল, বলিল, 'তোমার যত সব আষাঢ়ে গল্প। বাঁদরের কখনও এত বুদ্ধি হয়?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'এটা বুদ্ধি নয়, হৃদয়াবেগ; সরল ভাষায় যৌন ঈর্ষা। মানুষের মধ্যেও যে ও-বস্তুটি আছে আশা করি তা অস্বীকার করবে না। পুরুষের মধ্যে তো আছেই, মেয়েদের মধ্যে আরও বেশী আছে। আমি যদি মহীধরবাবুর মেয়ে রজনীর সঙ্গে বেশী মাখামাখি করি তোমার ভাল লাগবে না।'

সত্যবতী র‍্যাপারের একটা প্রান্ত ঠোঁটের উপর ধরিয়া নত চক্ষে চুপ করিয়া রহিল। আমি বলিলাম, 'কিন্তু এই ঈর্ষার সঙ্গে ছবি চুরির সম্বন্ধটা কি?'

'যেখানে স্ত্রী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা আছে সেখানেই এ ধরনের ঈর্ষা থাকতে পারে।' বলিয়া ব্যোমকেশ ঊর্ধ্বমুখে ছাদের পানে চাহিয়া রহিল।

বলিলাম, 'মোটিভ খুব জোরালো মনে হচ্ছে না। কিন্তু এ ছাড়া অন্য কোনও উদ্দেশ্য

থাকতে পারে না কি?'

'পারে। চিত্রকর ফাল্গুনী পাল চুরি করে থাকতে পারে। একটা মানুষকে একবার মাত্র দেখে সে ছবি আঁকতে পারে, তার এই দাবি সম্ভবতঃ মিথ্যে। ফটো দেখে ছবি সহজেই আঁকা যায়। ফাল্গুনী সকলের চোখে চমক লাগিয়ে দিয়ে বেশী টাকা রোজগার করবার চেষ্টা করছে কিনা কে জানে!'

'হুঁ। আর কিছু?'

ব্যোমকেশ হাসিয়া বলিল, 'ফটোগ্রাফার নকুলেশবাবু স্বয়ং ছবি চুরি করে থাকতে পারেন।'

'নকুলেশবাবুর স্বার্থ কি?'

'তাঁর ছবি আরও বিক্রি হবে এই স্বার্থ।' বলিয়া ব্যোমকেশ মুচকি মুচকি হাসিতে লাগিল।

'এটা সম্ভব বলে তোমার মনে হয়?'

'ব্যবসাদারের পক্ষে অসম্ভব কিছুই নয়। আমেরিকায় ফসলের দাম বাড়াবার জন্য ফসল পুড়িয়ে দেয়।'

'আচ্ছা। আর কেউ?'

'ঐ দলের মধ্যে হয়তো এমন কেউ আছে যে নিশ্চিহ্নভাবে নিজের অস্তিত্ব মুছে ফেলতে চায়—'

'মানে—দাগী আসামী?'

'এই সময় ঘরের বন্ধ দ্বারে মৃদু টোকা পড়িল। আমি গিয়া দ্বার খুলিয়া দিলাম। অধ্যাপক সোম গরম ড্রেসিং-গাউন পরিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। তাঁহাকে স্বাগত করিলাম। আমরা আসা অবধি তিনি প্রায় প্রত্যহ এই সময় একবার নামিয়া আসেন। কিছুক্ষণ গল্পগুজব হয়; তারপর আহারের সময় হইলে তিনি চলিয়া যান। তাঁহার গৃহিণী দিনের বেলা দু' একবার আসিয়াছেন বটে, কিন্তু সত্যবতীর সঙ্গে বিশেষ ঘনিষ্ঠতা করিবার আগ্রহ তাঁহার দেখা যায় নাই। সত্যবতীও মহিলাটির প্রতি গভীর আকর্ষণ অনুভব করে নাই।

সোম আসিয়া বসিলেন। তাঁহাকে একটি সিগারেট দিয়া নিজে একটি ধরাইলাম। ব্যোমকেশের সাক্ষাতে ধূমপান করিবার এই একটা সুযোগ; সে খিঁচাইতে পারিবে না।

সোম জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আজ পার্টি কেমন লাগল?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'বেশ লাগল। সকলেই বেশ কর্ষিতচিত্ত ভদ্রলোক বলে মনে হল।'

সোম সিগারেটে একটা টান দিয়া বলিলেন, 'বাইরে থেকে সাধারণতঃ তাই মনে হয়। কিন্তু সেকথা আপনার চেয়ে বেশী কে জানে? মিসেস বক্সী, আজ যাঁদের সঙ্গে আলাপ হল তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে কাকে ভাল লাগল বলুন।'

সত্যবতী নিঃসংশয়ে বলিল, 'রজনীকে। ভারি সুন্দর স্বভাব, আমার বড্ড ভাল লেগেছে।'

সোমের মুখে একটু অরুণাভা ফুটিয়া উঠিল। সত্যবতী সেদিকে লক্ষ্য না করিয়া বলিয়া চলিল, 'যেমন মিষ্টি চেহারা তেমনি মিষ্টি কথা; আর ভারি বুদ্ধিমতী।— আচ্ছা, মহীধরবাবু এখনও মেয়ের বিয়ে কেন দিচ্ছেন না? ওঁর তো টাকার অভাব নেই।'

দ্বারের নিকট হইতে একটি তীব্র তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর শুনিয়া আমরা চমকিয়া উঠিলাম—

'বিধবা! বিধবা! বিধবাকে কোন্ হিঁদুর ছেলে বিয়ে করবে?' মালতী দেবী কখন দ্বারের কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন জানিতে পারি নাই। সংবাদটি যেমন অপ্রত্যাশিত, সংবাদ-দাত্রীর আবির্ভাবও তেমনি বিস্ময়কর। হতভম্ব হইয়া তাকাইয়া রহিলাম। মালতী দেবী ঈর্ষাতিক্ত নয়নে আমাদের একে একে নিরীক্ষণ করিয়া আবার বলিলেন, 'বিশ্বাস হচ্ছে না? উনি জানেন, ওঁকে জিজ্ঞেস করুন। এখানে সবাই জানে। অতি বড় বেহায়া না হলে বিধবা মেয়ে আইবুড্ডো সেজে বেড়ায় না। কিন্তু দু'কান কাটার কি লজ্জা আছে? অত যে ছলা-কলা ওসব পুরুষ ধরবার ফাঁদ।'

মালতী দেবী যেমন আচম্বিতে আসিয়াছিলেন তেমনি অকস্মাৎ চলিয়া গেলেন। সিঁড়িতে

তাঁর দুম্ দুম্ পায়ের শব্দ শোনা গেল।

আমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী অভিভূত হইয়াছিলেন অধ্যাপক সোম। তিনি লজ্জায় মাথা তুলিতে পারিতেছিলেন না। কিছুক্ষণ নীরবে কাটিয়া গেল। শেষে তিনি বিড়ম্বিত মুখ তুলিয়া দীনকণ্ঠে বলিলেন, 'আমাকে আপনারা মাপ করুন। মাঝে মাঝে ইচ্ছে হয় কোথাও পালিয়ে যাই—' তাঁর স্বর বুজিয়া গেল।

ব্যোমকেশ শান্তস্বরে প্রশ্ন করিল, 'রজনী সত্যিই বিধবা?'

সোম ধীরে ধীরে বলিলেন, 'হ্যাঁ। চৌদ্দ বছর বয়সে বিধবা হয়। মহীধরবাবু বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি কৃতি ছাত্রের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলেন। বিয়ের দু'দিন পরে প্লেনে চড়ে সে বিলেত যাত্রা করে; মহীধরবাবুই জামাইকে বিলেত পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু সে বিলেত পর্যন্ত পৌঁছল না; পথেই বিমান দুর্ঘটনা হয়ে মারা গেল। রজনীকে কুমারী বলা চলে।'

কিছুক্ষণ সবাই চুপচাপ। আমি সোমকে আর একটি সিগারেট দিলাম এবং দেশলাই জ্বালাইয়া ধরিলাম। সিগারেট ধরাইয়া সোম বলিলেন, 'আপনারা আমার পারিবারিক পরিস্থিতি বুঝতে পেরেছেন। আমার জীবনের ইতিহাসও অনেকটা মহীধরবাবুর জামাইয়ের মত। গরীবের ছেলে ছিলাম এবং ভাল ছাত্র ছিলাম। বিয়ে করে শ্বশুরের টাকায় বিলেত যাই। কিন্তু উপসংহারটা সম্পূর্ণ অন্য রকমের হল। আমি বিদ্যালাভ করে ফিরে এলাম এবং কলেজের অধ্যাপক হলাম। কিন্তু বেশীদিন টিকতে পারলাম না। কাজ ছেড়ে দিয়ে আজ সাত বছর এখানে বাস করছি। অন্ন-বস্ত্রের অভাব নেই; আমার স্ত্রীর অনেক টাকা।'

কথাগুলিতে অন্তরের তিক্ততা ফুটিয়া উঠিল। আমি একটু ইতস্ততঃ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কাজ ছেড়ে দিলেন কেন?'

সোম উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, 'লজ্জায়। স্ত্রী-স্বাধীনতার যুগে স্ত্রীকে ঘরে বন্ধ করে রাখা যায় না—অথচ—। মাঝে মাঝে ভাবি, বিমান দুর্ঘটনাটা যদি রজনীর স্বামীর না হয়ে আমার হত সব দিক দিয়েই সুরাহা হত।'

সোম দ্বারের দিকে অগ্রসর হইলেন। ব্যোমকেশ পিছন হইতে বলিল, 'প্রোফেসর সোম যদি কিছু মনে না করেন একটা প্রশ্ন করি। যে গ্রুপ ছবিটা কিনেছিলেন সেটা কোথায়?'

সোম ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, 'সেটা আমার স্ত্রী কুচি কুচি করে ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছেন। তাতে আমি আর রজনী পাশাপাশি দাঁড়িয়েছিলাম।'

সোম ধীরপদে প্রস্থান করিলেন।

রাত্রে আহারে বসিয়া বেশী কথাবার্তা হইল না। হঠাৎ এক সময় সত্যবতী বলিয়া উঠিল 'যে যাই বলুক, রজনী ভারি ভাল মেয়ে। কম বয়সে বিধবা হয়েছে, বাপ যদি সাজিয়ে গুজিয়ে রাখতে চান তাতে দোষ কি?'

ব্যোমকেশ একবার সত্যবতীর পানে তাকাইল, তারপর নির্লিপ্ত স্বরে বলিল, 'আজ পার্টিতে একটা সামান্য ঘটনা লক্ষ্য করলাম, তোমাদের বোধ হয় চোখে পড়েনি। মহীধর-বাবু তখন ছবি চুরির গল্প আরম্ভ করেছেন, সকলের দৃষ্টি তাঁর দিকে। দেখলাম ডাক্তার ঘটক একটু দূরে দাঁড়িয়ে ছিল, রজনী চুপি চুপি তার কাছে গিয়ে তার পকেটে একটা চিঠির মতন ভাঁজ করা কাগজ ফেলে দিলে। দু'জনের মধ্যে একটা চকিত চাউনি খেলে গেল। তারপর রজনী সেখান থেকে সরে এল। আমার বোধ হয় আমি ছাড়া এ দৃশ্য আর কেউ লক্ষ্য করেনি। মালতী দেবীও না।'

দিন পাঁচ ছয় কাটিয়া গিয়াছে।

ব্যোমকেশের শরীর এই কয়দিনে আরও সারিয়াছে। তাহার আহার্যের বরাদ্দ বৃদ্ধি পাইয়াছে; সত্যবতী তাহাকে দিনে দুইটা সিগারেট খাইবার অনুমতি দিয়াছে। আমি নিত্য গুরুভোজনের ফলে দিন দিন খোদার খাসী হইয়া উঠিতেছি, সত্যবতীর গায়েও গত্তি লাগিয়াছে। এখন আমরা প্রত্যহ বৈকালে ব্যোমকেশকে লইয়া রাস্তায় রাস্তায় পাদচারণ করি, কারণ হাওয়া বদলের ইহা একটা অপরিহার্য অঙ্গ। সকলেই খুশী।

একদিন আমরা পথ-ভ্রমণে বাহির হইয়াছি, অধ্যাপক সোম আসিয়া আমাদের সঙ্গে যোগ দিলেন, বলিলেন, 'চলুন, আজ আমিও আপনাদের সহযাত্রী।'

সত্যবতী একটু উৎকণ্ঠিত হইয়া বলিল, 'মিসেস সোম কি—?'

সোম প্রফুল্ল স্বরে বলিলেন, 'তাঁর সর্দি হয়েছে। শুয়ে আছেন।'

সোম মিশুক লোক, কেবল স্ত্রী সঙ্গে থাকিলে একটু নির্জীব হইয়া পড়েন। আমরা নানা কথার আলোচনা করিতে করিতে পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলাম।

ছবি চুরির প্রসঙ্গ আপনা হইতেই উঠিয়া পড়িল। ব্যোমকেশ বলিল, 'আচ্ছা বলুন দেখি, ঐ ছবিখানা কাগজে বা পত্রিকায় ছাপানোর কোনও প্রস্তাব হয়েছিল কি?'

সোম চকিতে একবার ব্যোমকেশের পানে চাহিলেন, তারপর ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া ভাবিতে ভাবিতে বলিলেন, 'কৈ, আমি তো কিছু জানি না। তবে নকুলেশবাবু মাঝে কলকাতা গিয়েছিলেন বটে। কিন্তু আমাদের না জানিয়ে তিনি ছবি ছাপতে দেবেন কি? মনে হয় না। বিশেষতঃ ডেপুটি ঊষানাথবাবু জানতে পারলে ভারি অসন্তুষ্ট হবেন।'

'ঊষানাথবাবু অসন্তুষ্ট হবেন কেন?'

'উনি একটু অদ্ভুত গোছের লোক। বাইরে বেশ গাম্ভীর্য, কিন্তু ভিতরে ভিতরে ভীরু প্রকৃতি। বিশেষতঃ ইংরেজ মনিবকে* যমের মত ভয় করেন। সাহেবরা বোধ হয় চান না যে একজন হাকিম সাধারণ লোকের সঙ্গে ফটো তোলাবে, তাই ঊষানাথবাবুর ফটো তোলাতে ঘোর আপত্তি। মনে আছে, পিক্‌নিকের সময় তিনি প্রথমটা ফটোর দলে থাকতে চাননি, অনেক বলে-কয়ে রাজী করাতে হয়েছিল। এ ছবি যদি কাগজে ছাপা হয় নকুলেশবাবুর কপালে দুঃখ আছে।'

ব্যোমকেশের মুখ দেখিয়া বুঝিলাম সে মনে মনে উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছে। সে জিজ্ঞাসা করিল, 'ঊষানাথবাবু কি সব সময়েই কালো চশমা পরে থাকেন?'

সোম বলিলেন, 'হাঁ। উনি বছর দেড়েক হল এখানে বদলি হয়ে এসেছেন, তার মধ্যে আমি ওঁকে কখনও বিনা চশমায় দেখিনি। হয়তো চোখের কোনও দুর্বলতা আছে; আলো সহ্য করতে পারেন না।'

ব্যোমকেশ ঊষানাথবাবু সম্বন্ধে আর কোনও প্রশ্ন করিল না। হঠাৎ বলিল, 'ফটোগ্রাফার নকুলেশ সরকার লোকটি কেমন?'

সোম বলিলেন, 'চতুর ব্যবসাদার, ঘটে বুদ্ধি আছে। মহীধরবাবুকে খোসামোদ করে চলেন, শুনেছি তাঁর কাছে টাকা ধার নিয়েছেন।'

'তাই নাকি! কত টাকা?'

'তা ঠিক জানি না। তবে মোটা টাকা।'

এই সময় সামনে ফট্‌ফট্‌ শব্দ শুনিয়া দেখিলাম একটি মোটর-বাইক আসিতেছে। আরও কাছে আসিলে চেনা গেল, আরোহী ডি.এস্‌.পি পুরন্দর পাণ্ডে। তিনিও আমাদের চিনিয়াছিলেন, মোটর-বাইক থামাইয়া সহাস্যমুখে অভিবাদন করিলেন।

কুশল প্রশ্ন আদান-প্রদানের পর ব্যোমকেশ জিজ্ঞাসা করিল, 'ফাল্গুনী পাল আপনার

---

*যে সময়ের গল্প তখনও ইংরেজ রাজত্ব শেষ হয় নাই।

ছবি এঁকেছে?'

পাণ্ডে চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বলিলেন, 'তাজ্জব ব্যাপার মশাই, পর দিনই ছবি নিয়ে হাজির। একেবারে হুবহু ছবি এঁকেছে। অথচ আমার ফটো তার হাতে যাবার কোনই সম্ভাবনা নেই। সত্যি গুণী লোক। দশ টাকা খসাতে হল।'

ব্যোমকেশ সহাস্যে বলিল, 'কোথায় থাকে সে?'

পাণ্ডে বলিলেন, 'আর বলবেন না। অতবড় গুণী কিন্তু একেবারে হতভাগা। পাঁড় নেশাখোর—মদ গাঁজা গুলি কোকেন কিছুই বাদ যায় না। মাসখানেক এখানে এসেছে। এখানে এসে যেখানে সেখানে পড়ে থাকত, কোনও দিন কারুর বারান্দায়, কোনও দিন কারুর খড়ের গাদায় রাত কাটাত। মহীধরবাবু দয়া করে নিজের বাগানে থাকতে দিয়েছেন। ওঁর বাগানের কোণে একটা মেটে ঘর আছে, দু'দিন থেকে সেখানেই আছে।'

হতভাগ্য এবং চরিত্রহীন শিল্পীর যে-দশা হয় ফাল্গুনীরও তাহাই হইয়াছে। তবু কিছুদিনের জন্যও সে একটা আশ্রয় পাইয়াছে জানিয়া মনটা আশ্বস্ত হইল।

পাণ্ডে আবার গাড়িতে স্টার্ট দিবার উপক্রম করিলে সোম বলিলেন, 'আপনি এদিকে চলেছেন কোথায়?'

পাণ্ডে বলিলেন, 'মহীধরবাবুর বাড়ির দিকেই যাচ্ছি। নকুলেশবাবুর মুখে শুনলাম তিনি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। তাই বাড়ি যাবার পথে তাঁর খবর নিয়ে যাব।'

'কি অসুখ?'

'সামান্য সর্দিকাশি। কিন্তু ওঁর হাঁপানির ধাত।'

সোম বলিলেন, 'তাই তো, আমারও দেখতে যাওয়া উচিত। মহীধরবাবু আমাকে বড়ই স্নেহ করেন—'

পাণ্ডে বলিলেন, 'বেশ তো, আমার গাড়ির পিছনের সীটে উঠে বসুন না, এক সঙ্গেই যাওয়া যাক। ফেরবার সময় আপনাকে নামিয়ে দিয়ে যাব।'

'তাহলে তো ভালই হয়।' বলিয়া সোম মোটর-বাইকের পিছনে গদি-আঁটা আসনটিতে বসিয়া পাণ্ডের কোমর জড়াইয়া লইলেন।

ব্যোমকেশ বলিল, 'আচ্ছা, মহীধরবাবুকে বলে দেবেন আমরা কাল বিকেলে যাব।'

'আচ্ছা। নমস্কার।'

মোটর-বাইক দুইজন আরোহী লইয়া চলিয়া গেল। আমরাও বাড়ির দিকে ফিরিলাম। লক্ষ্য করিলাম ব্যোমকেশ আপন মনে মুখ টিপিয়া টিপিয়া হাসিতেছে।

বাড়ি ফিরিয়া চা পান করিতে বসিলাম। ব্যোমকেশ একটু অন্যমনস্ক হইয়া রহিল। দরজা খোলা ছিল; সিঁড়ির উপর ভারি পায়ের আওয়াজ শোনা গেল। ব্যোমকেশ চকিত হইয়া খাটো গলায় বলিল, 'অধ্যাপক সোম কোথায় গেছেন এ প্রশ্নের যদি জবাব দেবার দরকার হয়, বলো তিনি মিস্টার পাণ্ডের বাড়িতে গেছেন।'

কথাটা ভাল করিয়া হৃদয়ঙ্গম করিবার পূর্বেই প্রশ্নের উত্তর দিবার প্রয়োজন উপস্থিত হইল। মালতী দেবী দ্বারের কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন। সর্দিতে তাঁহার মুখখানা আরও ভারী হইয়া উঠিয়াছে, চক্ষু রক্তাভ; তিনি ঘরের চারিদিকে অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি প্রেরণ করিলেন। সত্যবতী উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, 'আসুন মিসেস সোম।'

মালতী দেবী ধরা ধরা গলায় বলিলেন, 'না, আমার শরীর ভাল নয়। উনি আপনাদের সঙ্গে বেরিয়েছিলেন, কোথায় গেলেন?'

ব্যোমকেশ দ্বারের কাছে আসিয়া সহজ সুরে বলিল, 'রাস্তায় পাণ্ডে সাহেবের সঙ্গে দেখা হয়েছিল, তিনি প্রোফেসর সোমকে নিজের বাড়িতে নিয়ে গেলেন।'

মালতী দেবী বিস্ময়ভরে বলিলেন, 'পুলিসের পাণ্ডে? ওঁর সঙ্গে তাঁর কি দরকার?'

ব্যোমকেশ সরলভাবে বলিল, 'তা তো কিছু শুনলাম না। পাণ্ডে বললেন, চলুন আমার বাড়িতে চা খাবেন। হয়তো কোনও কাজের কথা আছে।'

মালতী দেবী আমাদের তিনজনের মুখ ভাল করিয়া দেখিলেন, একটা গুরুভার নিশ্বাস

ফেলিলেন, তারপর আর কোনও কথা না বলিয়া উপরে চলিয়া গেলেন। আমরা ফিরিয়া আসিয়া বসিলাম।

ব্যোমকেশ আমাদের পানে চাহিয়া একটু লজ্জিত ভাবে হাসিল, বলিল, 'ডাহা মিথ্যে কথা বলতে হল। কিন্তু উপায় কি? বাড়িতে দাম্পত্য-দাঙ্গা হওয়াটা কি ভাল?'

সত্যবতী বাঁকা সুরে বলিল, 'তোমাদের সহানুভূতি কেবল পুরুষের দিকে। মিসেস সোম যে সন্দেহ করেন সে নেহাত মিছে নয়।'

ব্যোমকেশেরও স্বর গরম হইয়া উঠিল, 'আর তোমাদের সহানুভূতি কেবল মেয়েদের দিকে। স্বামীর ভালবাসা না পেলে তোমরা হিংসেয় চৌচির হয়ে যাও, কিন্তু স্বামীর ভালবাসা কি করে রাখতে হয় তা জান না।—যাক, অজিত, তোমাকে একটা কাজ করতে হবে ভাই; বাইরের বারান্দায় পাহারা দিতে হবে। সোম ফিরলেই তাঁকে চেতিয়ে দেওয়া দরকার, নৈলে মিথ্যে কথা যদি ধরা পড়ে যায় তাহলে সোম তো যাবেই, সেই সঙ্গে আমাদেরও অশেষ দুর্গতি হবে।'

আমার কোনই আপত্তি ছিল না। বাহিরের বারান্দায় একটা চেয়ার পড়িয়া থাকিত, তাহাতে বসিয়া মনের সুখে সিগারেট টানিতে লাগিলাম। বাহিরে একটু ঠাণ্ডা বেশী, কিন্তু আলোয়ান গায়ে থাকিলে কষ্ট হয় না।

সোম ফিরিলেন প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে। পাণ্ডের মোটর ফট্ ফট্ শব্দে ফটকের বাহিরে দাঁড়াইল, সোমকে নামাইয়া দিয়া চলিয়া গেল। তিনি বারান্দায় উঠিলে আমি বলিলাম, 'শুনে যান। কথা আছে।'

বসিবার ঘরে ব্যোমকেশ একলা ছিল। সোমের মুখ দেখিলাম, গম্ভীর ও কঠিন। ব্যোমকেশ বলিল, 'মহীধরবাবু কেমন আছেন?'

সোম সংক্ষেপে বলিলেন, 'ভালই।'

'ওখানে আর কেউ ছিল নাকি?'

'শুধু ডাক্তার ঘটক।'

ব্যোমকেশ তখন মালতী-সংবাদ সোমকে শুনাইল। সোমের গম্ভীর মুখে একটু হাসি ফুটিল। তিনি বলিলেন, 'ধন্যবাদ।'

৫

পরদিন প্রভাতে প্রাতরাশের সময় লক্ষ্য করিলাম দাম্পত্য কলহ কেবল বাড়ির উপরতলায় আবদ্ধ নাই, নীচের তলায় নামিয়া আসিয়াছে। সত্যবতীর মুখ ভারী, ব্যোমকেশের অধরে বঙ্কিম কঠিনতা। দাম্পত্য কলহ বোধ করি সর্দিকাশির মতই ছোঁয়াচে রোগ।

কি করিয়া দাম্পত্য কলহের উৎপত্তি হয়, কেমন করিয়া তাহার নিবৃত্তি হয়, এসব গূঢ় রহস্য কিছু জানি না। কিন্তু জিনিসটা নূতন নয়, ইতিপূর্বে দেখিয়াছি। ঋষি-শ্রাদ্ধের ন্যায় মহা ধুমধামের সহিত আরম্ভ হইয়া অচিরাৎ প্রভাতের মেঘ-ডম্বরবৎ শূন্যে মিলাইয়া যাইবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

আহার শেষ হইলে ব্যোমকেশ বলিল, 'অজিত, চল আজ সকালবেলা একটু বেরুনো যাক।'

বলিলাম, 'বেশ, চল। সত্যবতী তৈরি হয়ে নিক।'

সত্যবতী বিরসমুখে বলিল, 'আমার বাড়িতে কাজ আছে। সকাল বিকাল টো টো করে বেড়ালে চলে না।'

ব্যোমকেশ উঠিয়া শালটা গায়ে জড়াইতে জড়াইতে বলিল, 'আমরা দু'জনে যাব এই প্রস্তাবই আমি করেছিলাম। চল, মিছে বাড়িতে বসে থেকে লাভ নেই।'

সত্যবতী ব্যোমকেশের পায়ের দিকে একটা কটাক্ষপাত করিয়া তীক্ষ্ণ স্বরে বলিল,

যার রোগা শরীর তার মোজা পায়ে দিয়ে বাইরে যাওয়া উচিত।' বলিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

আমি হাসি চাপিতে না পারিয়া বারান্দায় গিয়া দাঁড়াইলাম। কয়েক মিনিট পরে ব্যোমকেশ বাহির হইয়া আসিল। তাহার ললাটে গভীর ভ্রূকুটি, কিন্তু পায়ে মোজা।

রাস্তায় বাহির হইলাম। ব্যোমকেশের যে কোনও বিশেষ গন্তব্য স্থান আছে তাহা বুঝিতে পারি নাই! ভাবিয়াছিলাম হাওয়া বদলকারীর স্বাভাবিক পরিব্রজনস্পৃহা তাহাকে চাপিয়া ধরিয়াছে। কিন্তু কিছু দূর যাইবার পর একটা খালি রিক্‌শা দেখিয়া সে তাহাতে উঠিয়া বসিল। আমিও উঠিলাম। ব্যোমকেশ বলিল, 'ডেপুটি ঊষানাথবাবুকা মোকাম চলো।'

রিক্‌শা চলিতে আরম্ভ করিলে আমি বলিলাম, 'হঠাৎ ঊষানাথবাবু?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'আজ রবিবার, তিনি বাড়ি থাকবেন। তাঁকে দু'একটা কথা জিজ্ঞেস করবার আছে।'

আধ মাইল পথ চলিবার পর আমি বলিলাম, 'ব্যোমকেশ, তুমি ছবি চুরির ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছ মনে হচ্ছে। সত্যিই কি ওতে গুরুতর কিছু আছে?'

সে বলিল, 'সেইটেই আবিষ্কারের চেষ্টা করছি।'

আরও আধ মাইল পথ উত্তীর্ণ হইয়া ঊষানাথবাবুর বাড়িতে পেঁছান গেল। হাকিম পাড়ায় বাড়ি, পাঁচিল দিয়া ঘেরা। ফটকের কাছে রিক্‌শাওয়ালাকে অপেক্ষা করিতে বলিয়া আমরা ভিতরে প্রবেশ করিলাম।

প্রথমেই চমক লাগিল, বাড়ির সদরে কয়েকজন পুলিসের লোক দাঁড়াইয়া আছে। তারপর দেখিলাম ডি.এস.পি পুরন্দর পাণ্ডের মোটর-বাইক রহিয়াছে।

ঊষানাথ ও পাণ্ডে সদর বারান্দায় ছিলেন। আমাদের দেখিয়া পাণ্ডে সবিস্ময়ে বলিলেন, 'একি, আপনারা!'

ব্যোমকেশ বলিল, 'আজ রবিবার, তাই বেড়াতে এসেছিলাম।'

ঊষানাথ হিমশীতল হাসিয়া বলিলেন, 'আসুন। কাল রাত্রে বাড়িতে চুরি হয়ে গেছে।'

'তাই নাকি? কি চুরি গেছে?'

পাণ্ডে বলিলেন, 'সেটা এখনও জানা যায়নি। রাত্রে এঁরা দোতলায় শোন্, নীচে কেউ থাকে না। ঘর বন্ধ থাকে। কাল রাত্রে আপিস-ঘরে চোর ঢুকে আলমারি খোলবার চেষ্টা করেছিল। একটা পর-চাবি তালায় ঢুকিয়েছিল, কিন্তু সেটা বের করতে পারেনি।'

'বটে! আলমারিতে কি ছিল?'

ঊষানাথবাবু বলিলেন, 'সরকারী দলিলপত্র ছিল, আর আমার স্ত্রীর গয়নার বাক্স ছিল। স্টিলের আলমারি। লোহার সিন্দুক বলতে পারেন।'

ঊষানাথবাবুর চোখে কালো চশমা, চোখ দেখা যাইতেছে না। কিন্তু তৎসত্ত্বেও তাঁহার মুখ দেখিয়া মনে হয়, তিনি ভয় পাইয়াছেন। ব্যোমকেশ বলিল, 'তাহলে চোর কিছু নিয়ে যেতে পারেনি?'

পাণ্ডে বলিলেন, 'সেটা আলমারি না খোলা পর্যন্ত বোঝা যাচ্ছে না। একটা চাবিওয়ালা ডাকতে পাঠিয়েছি।'

'হুঁ। চোর ঘরে ঢুকল কি করে?'

'কাচের জানালার একটা কাচ ভেঙে হাত ঢুকিয়ে ছিটকিনি খুলেছে। আসুন না দেখবেন।'

ঊষানাথবাবুর আপিস-ঘরে প্রবেশ করিলাম। মাঝারি আয়তনের ঘর, একটা টেবিল, কয়েকটা চেয়ার, স্টিলের আলমারি, দেওয়ালে ভারত-সম্রাটের ছবি—এছাড়া আর কিছু নাই। ব্যোমকেশ কাচ-ভাঙা জানালা পরীক্ষা করিল; আলমারির চাবি ঘুরাইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু চাবি ঘুরিল না। এই চাবিটা ছাড়া চোর নিজের আগমনের আর কোনও নিদর্শন রাখিয়া যায় নাই। আপিস-ঘরের পাশেই ড্রয়িং-রুম, মাঝে দরজা। আমরা সেখানে গিয়া বসিলাম। আলমারিটা খোলা না হওয়া পর্যন্ত কিছু চুরি গিয়াছে কিনা জানা যাইবে

না। ঊষানাথবাবু চায়ের প্রস্তাব করিলেন, আমরা মাথা নাড়িয়া প্রত্যাখ্যান করিলাম।

ড্রয়িং-রুমটি মামুলী ভাবে সাজানো গোছানো। এখানেও দেওয়ালে ভারত-সম্রাটের ছবি। এক কোণে একটি রেডিও যন্ত্র। চেয়ারগুলির পাশে ছোট ছোট নীচু টেবিল; তাহাদের কোনটার উপর পিতলের ফুলদানী, কোনটার উপর ছবির এল্‌বাম; দামী জিনিস কিছু নাই।

ব্যোমকেশ বলিল, 'চোর বোধ হয় এ ঘরে ঢোকেনি।'

ঊষানাথবাবু বলিলেন, 'এ ঘরে চুরি করবার মত কিছু নেই।' বলিয়াই তিনি লাফাইয়া উঠিলেন। চোখের কালো চশমা ক্ষণেকের জন্য তুলিয়া কোণের রেডিও-যন্ত্রটার দিকে চাহিয়া রহিলেন, তারপর চশমা নামাইয়া বলিয়া উঠিলেন, 'আমার পরী! পরী কোথায় গেল!'

আমরা সমস্বরে বলিলাম, 'পরী!'

ঊষানাথবাবু রেডিওর কাছে গিয়া এদিক ওদিক দেখিতে দেখিতে বলিলেন, 'একটা রুপোলী গিল্‌টি-করা ছোট্ট পরী—ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের স্ত্রী আমাকে উপহার দিয়েছিলেন—সেটা রেডিওর ওপর রাখা থাকত। নিশ্চয় চোরে নিয়ে গেছে।' আমরাও উঠিয়া গিয়া দেখিলাম। রেডিও যন্ত্রের উপর আধুলির মত একটা স্থান সম্পূর্ণ শূন্য। পরী ঐ স্থানে অবস্থান করিতেন সন্দেহ নাই।

ব্যোমকেশ বলিল, 'চোর হয়তো নেয়নি। আপনার ছেলে খেলা করবার জন্যে নিয়ে থাকতে পারে। একবার খোঁজ করে দেখুন না।'

ঊষানাথবাবু ভ্রূ-কুঞ্চন করিয়া বলিলেন, 'খোকা সভ্য ছেলে, সে কখনও কোনও জিনিসে হাত দেয় না। যাহোক, আমি খোঁজ নিচ্ছি।'

তিনি উপরে উঠিয়া গেলেন। ব্যোমকেশ পাণ্ডেকে জিজ্ঞাসা করিল, 'কাউকে সন্দেহ করেন নাকি?'

পাণ্ডে বলিলেন, 'সন্দেহ—না, সে রকম কিছু নয়। তবে একটা আরদালি বলছে, কাল রাত্রি আন্দাজ সাড়ে সাতটার সময় একটা পাগলাটে গোছের লোক ডেপুটিবাবুর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। ডেপুটিবাবু দেখা করেননি, আরদালি বাইরে থেকেই তাকে হাঁকিয়ে দিয়েছে। আরদালি লোকটার যে-রকম বর্ণনা দিলে তাতে তো মনে হয়—'

'ফাল্গুনী পাল?'

'হ্যাঁ। একজন সাব-ইন্‌সপেক্টরকে খোঁজ নিতে পাঠিয়েছি।'

ঊষানাথবাবু উপর হইতে নামিয়া আসিয়া জানাইলেন তাঁহার স্ত্রী-পুত্র পরীর কোনও খবরই রাখেন না। নিশ্চয় চোর আর কিছু না পাইয়া রৌপ্যভ্রমে পরীকে লইয়া গিয়াছে।

ব্যোমকেশ ভ্রূ কুঁচকাইয়া বসিয়া ছিল, মুখ তুলিয়া বলিল, 'ভাল কথা, সেই ছবিটা আছে কিনা দেখেছিলেন কি?'

'কোন্ ছবি?'

'সেই যে একটা গ্রুপ-ফটোর্ কথা মহীধরবাবুর বাড়িতে হয়েছিল?'

'ও—না, দেখা হয়নি। ঐ যে আপনার পাশে এল্‌বাম রয়েছে, দেখুন না ওতেই আছে।'

ব্যোমকেশ এল্‌বাম লইয়া পাতা উল্টাইয়া দেখিতে লাগিল। তাহাতে ঊষানাথবাবুর পিতা মাতা, ভাই ভগিনী, স্ত্রী পুত্র সকলের ছবি আছে, এমন কি মহীধরবাবু ও রজনীর ছবিও আছে, কেবল উদ্দিষ্ট গ্রুপ-ফটোখানি নাই!

ব্যোমকেশ বলিল, 'কৈ, দেখছি না তো?'

'নেই।' ঊষানাথবাবু উঠিয়া আসিয়া নিজে এল্‌বাম দেখিলেন, কিন্তু ফটো পাওয়া গেল না। তিনি তখন বলিলেন, 'কি জানি কোথায় গেল। কিন্তু এটা এমন কিছু দামী জিনিস নয়। আলমারি থেকে যদি দলিলপত্র কিংবা গয়নার বাক্স চুরি গিয়ে থাকে—'

ব্যোমকেশ গাত্রোত্থান করিয়া বলিল, 'আপনি চিন্তা করবেন না, চোর কিছুই চুরি করতে পারেনি। গয়নার বাক্স নিরাপদে আছে, এমন কি, আপনার পরীও একটু খুঁজলেই পাওয়া যাবে। আজ তাহলে আমরা উঠি। মিস্টার পাণ্ডে, চোরের যদি সন্ধান পান আমাকে

বঞ্চিত করবেন না।'

পাণ্ডে হাসিয়া ঘাড় নাড়িলেন। আমরা বাহিরে আসিলাম; ঊষানাথবাবুও সঙ্গে সঙ্গে আসিলেন। ব্যোমকেশ ঊষানাথবাবুকে ইশারা করিয়া বারান্দার এক কোণে লইয়া গিয়া চুপিচুপি কিছুক্ষণ কথা বলিল। তারপর ফিরিয়া আসিয়া বলিল, 'চল।'

রিক্‌শাওয়ালা অপেক্ষা করিতেছিল, আমরা ফিরিয়া চলিলাম। ব্যোমকেশ চিন্তামগ্ন হইয়া রহিল, তারপর এক সময় বলিল, 'অজিত, ঊষানাথবাবু এক সময় চোখের চশমা তুলেছিলেন, তখন কিছু লক্ষ্য করেছিলে?'

'কৈ না। কি লক্ষ্য করব?'

'ঊষানাথবাবুর বাঁ চোখটা পাথরের।'

'তাই নাকি? কালো চশমার এই অর্থ?'

'হ্যাঁ। বছর তিনেক আগে ওঁর চোখের ভেতরে ফোড়া হয়, অস্ত্র করে চোখটা বাদ দিতে হয়েছিল। ওঁর সর্বদা ভয় সাহেবরা জানতে পারলেই ওঁর চাকরি যাবে।'

'আচ্ছা ভীতু লোক তো! এই কথাই বুঝি আড়ালে গিয়ে হচ্ছিল?'

'হ্যাঁ।'

এই তথ্যের গুরুত্ব কতখানি তাহা নির্ণয় করিতে পারিলাম না। ঊষানাথবাবু যদি কানা-ই হন তাহাতে পৃথিবীর কি ক্ষতিবৃদ্ধি?

রিক্‌শা ক্রমে বাড়ির নিকটবর্তী হইতে লাগিল। ব্যোমকেশ বলিল, 'অজিত, যাবার সময় তুমি প্রশ্ন করেছিলে, ছবি চুরির ব্যাপার গুরুতর কিনা। সে প্রশ্নের উত্তর এখন দেওয়া যেতে পারে। ব্যাপার গুরুতর।'

'সত্যি? কি করে বুঝলে?'

ব্যোমকেশ উত্তর দিল না, একটু মুচকি হাসিল।

৬

অপরাহ্ণে আমরা মহীধরবাবুর বাড়িতে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলাম। সত্যবতী বলিল, 'ঠাকুরপো, টর্চ নিয়ে যেও। ফিরতে রাত করবে নিশ্চয়।'

আমি টর্চ পকেটে লইয়া বলিলাম, 'তুমি এবেলাও তাহলে বেরুচ্ছ না?'

সত্যবতী বলিল, 'না। ওপরতলায় একটা মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়ে আছে, কথা কইবার লোক নেই। তার কাছে দু'দণ্ড বসে দুটো কথা কইলেও তার মনটা ভাল থাকবে।'

বলিলাম, 'মালতী দেবীর প্রতি তোমার সহানুভূতি যে ক্রমে বেড়েই যাচ্ছে।'

'কেন বাড়বে না? নিশ্চয় বাড়বে।'

'আর রজনীর প্রতি সহানুভূতি বোধ করি সেই অনুপাতে কমে যাচ্ছে?'

'মোটেই না, একটুও কমেনি। রজনীর দোষ কি? যত নষ্টের গোড়া এই পুরুষ জাতটা।'

তর্জন করিয়া বলিলাম, 'দেখ, জাত তুলে কথা বললে ভাল হবে না বলছি।'

সত্যবতী নাক সিটকাইয়া রান্নাঘরের দিকে প্রস্থান করিল।

মহীধরবাবুর বাড়িতে যখন পৌঁছিলাম তখন সূর্যাস্ত হয় নাই বটে, কিন্তু বাগানের মধ্যে ঘোর-ঘোর হইয়া আসিয়াছে। খোলা ফটকে লোক নাই। রাত্রেও বোধ হয় ফটক খোলা থাকে, কিংবা গরু ছাগলের গতিরোধ করিবার জন্য আগড় লাগানো থাকে। মানুষের যাতায়াতে বাধা নাই।

বাড়ির সদর দরজা খোলা; কিন্তু বাড়িতে কেহ আছে বলিয়া মনে হইল না। দুই-তিন বার হ্রেষা-ধ্বনিবৎ গলা খাঁকারি দিবার পর একটি বৃদ্ধগোছের চাকর বাহির হইয়া আসিল। বলিল, 'কর্তাবাবু ওপরে শুয়ে আছেন। দিদিমণি বাগানে বেড়াচ্ছেন। আপনারা বসুন, আমি ডেকে আনছি।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'দরকার নেই। আমরাই দেখছি।' বাগানে নামিয়া ব্যোমকেশ বাগানের একটা কোণ লক্ষ্য করিয়া চলিল। গাছপালা ঝোপঝাড়ে বেশীদূর পর্যন্ত দেখা যায় না, কিন্তু ঘাসে ঢাকা সংকীর্ণ পথগুলি মাকড়সার জালের মত চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া গিয়াছে। বুঝিলাম ব্যোমকেশ ফাল্গুনী পালের আস্তানার সন্ধানে চলিয়াছে।

বাগানের কোণে আসিয়া পৌঁছিলাম। একটা মাটির ঘর, মাথায় টালির ছাউনি; সম্ভবতঃ মালীদের যন্ত্রপাতি রাখিবার স্থান। পাশেই একটা প্রকাণ্ড ইঁদারা।

ঘরের দ্বার খোলা রহিয়াছে, কিন্তু ভিতরে অন্ধকার। আমি টর্চের আলো ভিতরে ফেলিলাম। অন্ধকারে খড়ের বিছানার উপর কেহ শুইয়াছিল, আলো পড়িতেই উঠিয়া বাহিরে আসিল। দেখিলাম ফাল্গুনী পাল।

আজ ফাল্গুনীর মন ভাল নয়, কণ্ঠস্বরে ঔদাসীন্য-ভরা অভিমান। আমাদের দেখিয়া বলিল, 'আপনারাও কি পুলিসের লোক, আমার ঘর খানাতল্লাস করতে এসেছেন? আসুন—দেখুন, প্রাণ ভরে খানাতল্লাস করুন। কিছু পাবেন না। আমি গরীব বটে, কিন্তু চোর নই।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'আমরা খানাতল্লাস করতে আসিনি।' আপনাকে শুধু একটা কথা জিজ্ঞেস করতে চাই। কাল রাত্রে আপনি ঊষানাথবাবুর বাড়িতে কেন গিয়েছিলেন?'

ফাল্গুনী তিক্তস্বরে বলিল, 'তাঁর একটা ছবি এঁকেছিলাম, তাই দেখাতে গিয়েছিলাম। দারোয়ান দেখা করতে দিলে না, তাড়িয়ে দিলে। বেশ কথা, ভাল কথা। কিন্তু সেজন্য পুলিস লেলিয়ে দেবার কি দরকার?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'ভারি অন্যায়। আমি পুলিসকে বলে দেব, তারা আপনাকে আর বিরক্ত করবে না।'

'ধন্যবাদ' বলিয়া ফাল্গুনী আবার কোটরে প্রবেশ করিল। আমরা ফিরিয়া আসিলাম।

দিনের আলো প্রায় নিঃশেষ হইয়া আসিয়াছে। আমরা বাগানে ইতস্তত ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলাম, কিন্তু রজনীকে দেখিতে পাইলাম না।

বাগানের অন্য প্রান্তে বড় বড় পাথরের চাঙড় দিয়া একটা উচ্চ ক্রীড়াশৈল রচিত হইয়াছিল। তাহাকে ঘিরিয়া সবুজ শ্যাওলার বন্ধনী। ক্রীড়াশৈলটি আকারে চারকোণা, দেখিতে অনেকটা পিরামিডের মত। আমরা তাহার পাশ দিয়া যাইতে যাইতে থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িলাম। পিরামিডের অপর পার হইতে আবেগোদ্ধত কণ্ঠস্বর কানে আসিল, 'ছবি ছবি ছবি। কি হবে ছবি! চাই না ছবি!'

'আস্তে! কেউ শুনতে পাবে।'

কণ্ঠস্বর দুইটি পরিচিত; প্রথমটি ডাক্তার ঘটকের, দ্বিতীয়টি রজনীর। ডাক্তার ঘটককে আমরা শান্ত সংযতবাক্ মানুষ বলিয়াই জানি; তাহার কণ্ঠ হইতে যে এমন আর্ত উগ্রতা বাহির হইতে পারে তাহা কল্পনা করাও দুষ্কর। রজনীর কণ্ঠস্বরেও একটা শীৎকার আছে. কিন্তু তাহা অস্বাভাবিক নয়।

ডাক্তার ঘটক আবার যখন কথা কহিল তখন তাহার স্বর অপেক্ষকৃত হ্রস্ব হইয়াছে বটে, কিন্তু আবেগের উন্মাদনা কিছুমাত্র কমে নাই। সে বলিল, 'আমি তোমাকে চাই—তোমাকে। দুধের বদলে জল খেয়ে মানুষ বাঁচতে পারে না।'

রজনী বলিল, 'আর আমি! আমি কি চাই না? কিন্তু উপায় যে নেই।'

ডাক্তার বলিল, 'উপায় আছে, তোমাকে বলছি।'

রজনী বলিল, 'কিন্তু বাবা—'

ডাক্তার বলিল, 'তুমি নাবালিকা নও। তোমার বাবা তোমাকে আটকাতে পারেন না।'

রজনী বলিল, 'তা জানি। কিন্তু।—শোন লক্ষ্মীটি শোন, বাবার শরীর খারাপ যাচ্ছে, তিনি সেরে উঠুন—তারপর—'

ডাক্তার বলিল, 'না। আজই আমি জানতে চাই তুমি রাজী আছ কিনা।'

একটু নীরবতা। তারপর রজনী বলিল, 'আচ্ছা, আজই বলব, কিন্তু এখন নয়।

আমাকে একটু সময় দাও। আজ রাত্রি সাড়ে দশটার সময় তুমি এস, আমি এখানে থাকবো; তখন কথা হবে। এখন হয়তো বাড়িতে কেউ এসেছে, আমাকে না দেখলে—'

ব্যোমকেশ নিঃশব্দে আমার হাত ধরিয়া টানিয়া লইল।

দুজনে পা টিপিয়া ফিরিয়া আসিতেছি, হঠাৎ চোখে পড়িল পিরামিডের অন্য পাশ হইতে আর একটা লোক আমাদেরই মত সন্তর্পণে দূরে চলিয়া যাইতেছে। একবার মনে হইল বুঝি ডাক্তার ঘটক; কিন্তু ভাল করিয়া চিনিবার আগেই লোকটি অন্ধকারে অদৃশ্য হইয়া গেল।

পিরামিড হইতে অনেকখানি ঘুরিয়া দূরে আসিয়া ব্যোমকেশ বলিল, 'চল, বাড়ি ফেরা যাক। আজ আর দেখা করে কাজ নেই।'

রাস্তায় বাহির হইলাম। অন্ধকার হইয়া গিয়াছে, আকাশে চন্দ্র নাই, পথের পাশে কেরোসিনের আলোগুলি দূরে দূরে মিটমিট করিয়া জ্বলিতেছে। আমি মাঝে মাঝে টর্চ জ্বালিয়া পথ নির্ণয় করিতে করিতে চলিলাম।

ব্যোমকেশ চিন্তায় মগ্ন হইয়া আছে। বিদ্রোহোন্মুখ যুবক-যুবতীর নিয়তি কোন্ কুটিল পথে চলিয়াছে—বোধ করি তাহাই নির্ধারণের চেষ্টা করিতেছে। আমি তাহার ধ্যানভঙ্গ করিলাম না।

বাড়ির কাছাকাছি পৌঁছিয়া ব্যোমকেশ হঠাৎ প্রশ্ন করিল, 'অন্য লোকটিকে চিনতে পারলে?'

বলিলাম, 'না। কে তিনি?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'তিনি হচ্ছেন আমাদের গৃহস্বামী অধ্যাপক আদিনাথ সোম।'

'তাই নাকি! ব্যোমকেশ, ব্যাপারটা আমার পক্ষে কিছু জটিল হয়ে উঠেছে। ছবি চুরি, পরী চুরি, নেশাখোর চিত্রকর, কানা হাকিম, অবৈধ প্রণয়, অধ্যাপকের আড়িপাতা—কিছু বুঝতে পারছি না।'

'না পারবারই কথা। রবীন্দ্রনাথের গান মনে আছে—'জড়িয়ে গেছে সরু মোটা দুটো তারে, জীবন-বীণা ঠিক সুরে তাই বাজে না রে?'—আমিও সরু-মোটা তারের জট ছাড়াতে পারছি না।'

'আচ্ছা, এই যে ডাক্তার আর রজনীর ব্যাপার, এতে আমাদের কিছু করা উচিত নয় কি?'

ব্যোমকেশ দৃঢ়স্বরে বলিল, 'কিছু না। আমরা ক্রিকেট খেলার দর্শক, হাততালি দিতে পারি, দুয়ো দিতে পারি, কিন্তু খেলার মাঠে নেমে খেলায় বাগড়া দেওয়া আমাদের পক্ষে ঘোর বেয়াদপি।'

বাড়ি ফিরিয়া দেখিলাম সত্যবতী একাকিনী পশমের গেঞ্জি বুনিতেছে। বলিলাম, 'তোমার রুগীর খবর কি?'

সত্যবতী উত্তর দিল না, সেলাইয়ের উপর ঝুঁকিয়া দ্রুত কাঁটা চালাইতে লাগিল। জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কি, মুখে কথা নেই যে! মালতী দেবীকে দেখতে গিয়েছিলে তো?'

'গিয়েছিলাম'—সত্যবতী মুখ তুলিল না, কিন্তু তাহার মুখ ধীরে ধীরে লাল হইয়া উঠিতে লাগিল।

ব্যোমকেশ অদূরে দাঁড়াইয়া লক্ষ্য করিতেছিল, হঠাৎ হো হো করিয়া হাসিয়া নিজের শয়নকক্ষে প্রবেশ করিল। সত্যবতী সূচীবিদ্ধবৎ চমকিয়া উঠিল, শয়নকক্ষের দ্বারের দিকে একটা ক্রুদ্ধ কটাক্ষপাত করিল, তারপর আবার সম্মুখে ঝুঁকিয়া দ্রুত কাঁটা চালাইতে লাগিল।

আমি তাহার পাশে বসিয়া বলিলাম, 'কি ব্যাপার খুলে বল দেখি।'

'কিছু না। চা খাবে তো? জল চড়াতে বলে এসেছি। দেখি—' বলিয়া সে উঠিবার উপক্রম করিল।

আমি বাধা দিয়া বলিলাম, 'আহা, কি হয়েছে আগে বল না! চা পরে হবে।'

সত্যবতী তখন আবেগভরে বলিয়া উঠিল, 'কি আবার হবে, ঐ লক্ষ্মীছাড়া মেয়েমানুষটার

কাছে আমার যাওয়াই ভুল হয়েছিল। এমন পচা নোংরা মন—আমাকে বলে কিনা—কিন্তু সে আমি বলতে পারব না। যার অমন মন তার মুখে নুড়ো জ্বেলে দিতে হয়।'

শয়নকক্ষ হইতে আর এক ধমক হাসির আওয়াজ আসিল। সত্যবতী চলিয়া গেল। ব্যাপার বুঝিতে বাকি রহিল না। রাগে আমার মুখও উত্তপ্ত হইয়া উঠিল। সন্দিগ্ধমনা স্ত্রীলোকের সন্দেহ পাত্রপাত্রী বিচার করে না জানি, কিন্তু সত্যবতীকে যে স্ত্রীলোক এরূপ পঙ্কিল দোষারোপ করিতে পারে, তাকে গুলি করিয়া মারা উচিত। ব্যোমকেশ হাসুক, আমার গা রি রি করিয়া জ্বলিতে লাগিল।

রাত্রে শয়ন করিতে গিয়া ঘুম আসিল না; সারাদিনের নানা ঘটনায় মাথা গরম হইয়া উঠিয়াছে। ঘড়িতে দেখিলাম দশটা; ডিসেম্বর মাসে রাত্রি দশটা এখানে গভীর রাত্রি। ব্যোমকেশ ও সত্যবতী অনেকক্ষণ শুইয়া পড়িয়াছে।

বিছানায় শুইয়া ঘুম না আসিলে আমার সিগারেটের পিপাসা জাগিয়া ওঠে, সুতরাং শয্যাত্যাগ করিয়া উঠিতে হইল। গায়ে আলোয়ান দিয়া সিগারেট ধরাইলাম। কিন্তু বন্ধ ঘরে ধূমপান করিলে ঘরের বাতাস ধোঁয়ায় দূষিত হইয়া উঠিবে; আমি একটা জানালা ঈষৎ খুলিয়া তাহার সামনে দাঁড়াইয়া সিগারেট টানিতে লাগিলাম।

জানালাটা সদরের দিকে। সামনে ফটক, তাহার পরপারে রাস্তা, রাস্তার ধারে মিউনিসিপ্যালিটির আলোকস্তম্ভ; আলোকস্তম্ভ না বলিয়া ধূমস্তম্ভ বলিলেই ভাল হয়। প্রদীপের তৈল শেষ হইয়া আসিতেছে।

মিনিট দুই তিন জানালার কাছে দাঁড়াইয়া আছি, বাহিরে একটা অস্পষ্ট খস্ খস্ শব্দে চকিত হইয়া উঠিলাম। কে যেন বারান্দা হইতে নামিতেছে। জানালার ফাঁক দিয়া দেখিলাম একটি ছায়ামূর্তি ফটক পার হইয়া বাহিরে চলিয়া গেল। আলোকস্তম্ভের পাশ দিয়া যাইবার সময় তাহাকে চিনিতে পারিলাম—কালো কোট-প্যান্ট-পরা অধ্যাপক সোম।

বিদ্যুৎ চমকের মত বুঝিতে পারিলাম এত রাত্রে তিনি কোথায় যাইতেছেন। আজ রাত্রি সাড়ে দশটার সময় মহীধরবাবুর বাগানে ডাক্তার ঘটক এবং রজনীর মিলিত হইবার কথা; সংকেত-স্থলে সোম অনাহূত উপস্থিত থাকিবেন। কিন্তু কেন? কি তাঁহার অভিপ্রায়?

বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া মনে মনে এই কথা ভাবিতেছি, সহসা অধিক বিস্ময়ের কারণ ঘটিল। আবার খস্ খস্ শব্দ শুনিতে পাইলাম। এবার বাহির হইয়া আসিল মালতী দেবী। তাঁহাকে চিনিতে কষ্ট হইল না। একটা চাপা কাশির শব্দ; তারপর সোম যে পথে গিয়াছিলেন তিনিও সেই পথে অদৃশ্য হইয়া গেলেন।

পরিস্থিতি স্পষ্টই বোঝা গেল। স্বামী অভিসারে যাইতেছেন, আর স্ত্রী অসুস্থ শরীর লইয়া এই শীতজর্জর রাত্রে তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিয়াছেন। বোধ হয় স্বামীকে হাতে হাতে ধরিতে চান। উঃ, কি দুর্বহ ইহাদের জীবন! প্রেমহীন স্বামী এবং বিশ্বাসহীন পত্নীর দাম্পত্য জীবন কি ভয়ঙ্কর! এর চেয়ে ডাইভোর্স ভাল।

বর্তমান ক্ষেত্রে আমার কিছু করা উচিত কিনা ভাবিতে লাগিলাম। ব্যোমকেশকে জাগাইয়া সংবাদটা দিব? না, কাজ নাই, সে ঘুমাইতেছে ঘুমাক। বরং আমার ঘুম যেরূপ চটিয়া গিয়াছে, দু'ঘণ্টার মধ্যে আসিবে বলিয়া মনে হয় না। সুতরাং আমি জানালার কাছে বসিয়া পাহারা দিব। দেখা যাক কোথাকার জল কোথায় গড়ায়।

আবার সিগারেট ধরাইলাম।

পাঁচ মিনিট, দশ মিনিট। দীপস্তম্ভের আলো ধোঁয়ায় দম বন্ধ হইয়া মরিয়া গেল।

একটি মূর্তি ফটক দিয়া প্রবেশ করিল। নক্ষত্রের আলোয় মালতী দেবীর ভারী মোটা চেহারা চিনিতে পারিলাম। তিনি পদশব্দ গোপনের চেষ্টা করিলেন না। তাঁহার কণ্ঠ হইতে একটা অবরুদ্ধ আওয়াজ বাহির হইল, তাহা চাপা কাশি কিংবা চাপা কান্না বুঝিতে পারিলাম না। তিনি উপরে চলিয়া গেলেন।

এত শীঘ্র শ্রীমতী ফিরিয়া আসিলেন, কিন্তু শ্রীমানের দেখা নাই। অনুমান করিলাম শ্রীমতী বেশী দূর স্বামীকে অনুসরণ করিতে পারেন নাই, অন্ধকারে হারাইয়া ফেলিয়াছেন।

তারপর এদিক ওদিক নিষ্ফল অন্বেষণ করিয়া গৃহে ফিরিয়াছেন।

সোম ফিরিলেন সাড়ে এগারটার সময়। বাদুড়ের মত নিঃশব্দ সঞ্চারে বাড়ির মধ্যে মিলাইয়া গেলেন।

৭

সকালে ব্যোমকেশকে রাত্রির ঘটনা বলিলাম। সে চুপ করিয়া শুনিল, কোনও মন্তব্য করিল না।

একজন কনেস্টবল একটা চিঠি দিয়া গেল। ডি.এস.পি পাণ্ডের চিঠি, আগের দিন সন্ধ্যা ছ'টার তারিখ। চিঠিতে মাত্র কয়েক ছত্র লেখা ছিল—

প্রিয় ব্যোমকেশবাবু,

ডেপুটি সাহেবের আলমারি খুলিয়া দেখা গেল কিছু চুরি যায় নাই। আপনি বলিয়াছিলেন পরীকে খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে, কিন্তু পরী এখনও নিরুদ্দেশ। চোরেরও কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই। আপনি জানিতে চাহিয়াছিলেন তাই লিখিলাম। ইতি—

পুরন্দর পাণ্ডে

ব্যোমকেশ চিঠিখানা পকেটে রাখিয়া বলিল, 'পাণ্ডে লোকটি সত্যিকার সজ্জন।'

এই সময় যিনি সবেগে আসিয়া উপস্থিত হইলেন তিনি ফটোগ্রাফার নকুলেশ সরকার। মহীধরবাবুর পার্টির পর রাস্তায় নকুলেশবাবুর সহিত দু'একবার দেখা হইয়াছিল। তিনি অত্যন্ত উত্তেজিত ভাবে বলিলেন, 'এদিক দিয়ে যাচ্ছিলাম, ভাবলাম খবরটা দিয়ে যাই। শোনেননি নিশ্চয়ই? ফাল্গুনী পাল—সেই যে ছবি আঁকত—সে মহীধরবাবুর বাগানে কুয়োয় ডুবে মরেছে।'

কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া রহিলাম। তারপর ব্যোমকেশ বলিল, 'কখন এ ব্যাপার হল?'

নকুলেশ বলিলেন, 'বোধ হয় কাল রাত্তিরে, ঠিক জানি না। মাতাল দাঁতাল লোক, অন্ধকারে তাল সামলাতে পারেনি, পড়েছে কুয়োয়। আজ সকালে আমি মহীধরবাবুর খবর নিতে গিয়েছিলাম, দেখি মালীরা কুয়ো থেকে লাস তুলছে।'

আমরা নীরবে পরস্পর পরস্পরের মুখের পানে চাহিলাম। কাল রাত্রে মহীধরবাবুর বাগানে বহু বিচিত্র ব্যাপার ঘটিয়াছে।

'আচ্ছা, আজ তাহলে উঠি; আমাকে আবার ক্যামেরা নিয়ে ফিরে যেতে হবে—।' বলিয়া নকুলেশবাবু উঠিবার উপক্রম করিলেন।

'বসুন বসুন, চা খেয়ে যান।'

নকুলেশ চায়ের আমন্ত্রণ উপেক্ষা করিতে পারিলেন না, বসিলেন। অচিরাৎ চা আসিয়া পড়িল। দু'চার কথার পর ব্যোমকেশ প্রশ্ন করিল, 'সেই গ্রুপ-ফটোর নেগেটিভখানা খুঁজেছিলেন কি?'

'কোন্ নেগেটিভ? ও—হ্যাঁ, অনেক খুঁজেছি মশাই, পাওয়া গেল না।—আমার লোকসানের বরাত; থাকলে আরও পাঁচখানা বিক্রি হত।'

'আচ্ছা, সেই ফটোতে কে কে ছিল বলুন দেখি?'

'কে কে ছিল? পিক্‌নিকে গিয়েছিলাম ধরুন—আমি, মহীধরবাবু, তাঁর মেয়ে রজনী, ডাক্তার ঘটক, সস্ত্রীক প্রোফেসর সোম, সপরিবারে ডেপুটি ঊষানাথবাবু আর ব্যাঙ্কের ম্যানেজার অমরেশ রাহা। সকলেই ফটোতে ছিলেন। ফটোখানা ভারি উৎরে গিয়েছিল—গ্রুপ-ফটো অত ভাল খুব একটা হয় না। আচ্ছা, চলি তাহলে। আর একদিন আসব।'

নকুলেশবাবু প্রস্থান করিলেন। দু'জনে কিছুক্ষণ বসিয়া রহিলাম। ফাল্গুনীর কথা ভাবিয়া মনটা ভারী হইয়া উঠিল। সে নেশাখোর লক্ষ্মীছাড়া ছিল, কিন্তু ভগবান তাহাকে প্রতিভা দিয়াছিলেন। এমনভাবে অপঘাত মৃত্যুই যদি তাহার নিয়তি, তবে তাহাকে প্রতিভা

দিবার কি প্রয়োজন ছিল?

ব্যোমকেশ একটা নিশ্বাস ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল; বলিল, 'এ সম্ভাবনা আমার মনেই আসেনি। চল, বেরুনো যাক।'

'কোথায় যাবে?'

'ব্যাঙ্কে যাব। কিছু টাকা বের করতে হবে।'

এখানে আসিয়া স্থানীয় ব্যাঙ্কে কিছু টাকা জমা রাখা হইয়াছিল, সংসার-খরচের প্রয়োজন অনুসারে বাহির করা হইত।

আমরা সদর বারান্দায় বাহির হইয়াছি, দেখিলাম অধ্যাপক সোম ড্রেসিং-গাউন পরিহিত অবস্থায় নামিয়া আসিতেছেন। তাঁহার মুখে উদ্বিগ্ন গাম্ভীর্য। ব্যোমকেশ সম্ভাষণ করিল, 'কি খবর?'

সোম বলিলেন, 'খবর ভাল নয়। স্ত্রীর অসুখ খুব বেড়েছে। বোধ হয় নিউমোনিয়া। জ্বর বেড়েছে; মাঝে মাঝে ভুল বকছেন মনে হল।'

আশ্চর্য নয়। কাল রাত্রে সর্দির উপর ঠান্ডা লাগিয়াছে। কিন্তু সোম বোধ হয় তাহা জানেন না। ব্যোমকেশ বলিল, 'ডাক্তার ঘটককে খবর দিয়েছেন?'

ডাক্তার ঘটকের নামে সোমের মুখ অন্ধকার হইল। তিনি বলিলেন, 'ঘটককে ডাকব না। আমি অন্য ডাক্তার ডাকতে পাঠিয়েছি।'

ব্যোমকেশ তীক্ষ্ণ চক্ষে তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিয়া বলিল, 'কেন? ডাক্তার ঘটকের ওপর কি আপনার বিশ্বাস নেই? আমি যখন প্রথম এসেছিলাম তখন কিন্তু আপনি ঘটককেই সুপারিশ করেছিলেন।'

সোম ওষ্ঠাধর দৃঢ়বদ্ধ করিয়া নীরব রহিলেন। ব্যোমকেশ তখন বলিল, 'সে যাক! এই মাত্র খবর পেলাম ফাল্গুনী পাল কাল রাত্রে মহীধরবাবুর কুয়োয় ডুবে মারা গেছে।'

সোম বিশেষ ঔৎসুক্য প্রকাশ করিলেন না, বলিলেন, 'তাই নাকি। হয়তো আত্মহত্যা করেছে। আর্টিস্টরা একটু অব্যবস্থিতচিত্ত হয়—'

ব্যোমকেশ বন্দুকের গুলির মত প্রশ্ন করিল, 'প্রোফেসর সোম, কাল রাত্রি এগারোটার সময় আপনি কোথায় ছিলেন?'

সোম চমকিয়া উঠিলেন, তাঁহার মুখ পাংশু হইয়া গেল। তিনি স্খলিতস্বরে বলিলেন, 'আমি—আমি! কে বললে আমি কোথাও গিয়েছিলাম? আমি তো—'

হাত তুলিয়া ব্যোমকেশ বলিল, 'মিছে কথা বলে লাভ নেই। প্রোফেসর সোম, আপনার স্ত্রীর যে আজ বাড়াবাড়ি হয়েছে তার জন্যে আপনি দায়ী। তিনি কাল আপনার পেছন পেছনে রাস্তায় বেরিয়েছিলেন। এই রোগে যদি তাঁর মৃত্যু হয়—'

ভয়-বিস্ফারিত চক্ষে চাহিয়া সোম বলিলেন, 'আমার স্ত্রী—ব্যোমকেশবাবু, বিশ্বাস করুন, আমি জানি না—'

ব্যোমকেশ তর্জনী তুলিয়া ভয়ঙ্কর গম্ভীর স্বরে বলিল, 'কিন্তু আমরা জানি। আমি আপনার শুভাকাঙ্ক্ষী, তাই সতর্ক করে দিচ্ছি। আপনি সাবধানে থাকবেন। এস অজিত।'

সোম স্তম্ভের মত দাঁড়াইয়া রহিলেন, আমরা বাহির হইয়া পড়িলাম। রাস্তায় কিছু দূর গিয়া ব্যোমকেশ বলিল, 'সোমকে খুব ভয় পাইয়ে দিয়েছি।' তারপর ঘড়ি দেখিয়া বলিল, 'ব্যাঙ্ক খুলতে এখনও দেরি আছে। চল, ঘটকের ডিস্‌পেনসারিতে একবার ঢুঁ মেরে যাই।'

বাজারের দিকে ডাক্তারের ঔষধালয়। সবে খুলিয়াছে। আমরা ডাক্তারের ঘরে প্রবেশ করিতে যাইব, শুনিলাম সে একজনকে বলিতেছে, 'দেখুন, আপনার ছেলের টাইফয়েড হয়েছে; লম্বা কেস, সারাতে সময় লাগবে। আমি এখন লম্বা কেস হাতে নিতে পারব না। আপনি বরং শ্রীধরবাবুর কাছে যান—তিনি প্রবীণ ডাক্তার—'

আমরা প্রবেশ করিলাম, অন্য লোকটি চলিয়া গেল। ডাক্তার সানন্দে আমাদের অভ্যর্থনা করিল। বলিল, 'আসুন আসুন। রোগী যখন সশরীরে ডাক্তারের বাড়িতে আসে তখন

বুঝতে হবে রোগ সেরেছে। মহীধরবাবু সেদিন আমাকে ঘোড়ার ডাক্তার বলেছিলেন। এখন আপনিই বলুন, আমি মানুষের ডাক্তার কিংবা আপনি ঘোড়া!'—বলিয়া উচ্চকণ্ঠে হাসিল। ডাক্তারের মন আজ ভারি প্রফুল্ল; চোখে আনন্দের জ্যোতি।

ব্যোমকেশ হাসিয়া বলিল, 'আপনি মানুষের ডাক্তার এই কথা স্বীকার করে নেওয়াই আমার পক্ষে সম্মানজনক। মহীধরবাবু কেমন আছেন?'

ডাক্তার বলিল, 'অনেকটা ভাল। প্রায় সেরে উঠেছেন।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'ফাল্গুনী পাল মারা গেছে শুনেছেন কি?'

ডাক্তার চকিত হইয়া বলিল, 'সেই চিত্রকর! কি হয়েছিল তার?'

'কিছু হয়নি। কাল রাত্রে জলে ডুবে মারা গেছে'—ব্যোমকেশ যতটুকু জানিত সংক্ষেপে বলিল।

ডাক্তার কিছুক্ষণ বিমনা হইয়া রহিল, তারপর বলিল, 'আমার যাওয়া উচিত। মহীধর-বাবুর দুর্বল শরীর—। যাই, একবার চট্ করে ঘুরে আসি।' ডাক্তার উঠিয়া দাঁড়াইল।

ব্যোমকেশ সহসা জিজ্ঞাসা করিল, 'আপনি কলকাতা যাচ্ছেন কবে?'

ডাক্তারের মুখের ভাব সহসা পরিবর্তিত হইল; সে কিছুক্ষণ স্থিরদৃষ্টিতে ব্যোমকেশের চোখের মধ্যে চাহিয়া বলিল, 'আমি কলকাতা যাচ্ছি কে বললে আপনাকে?'

ব্যোমকেশ কেবল মৃদু হাসিল। ডাক্তার তখন বলিল, 'হ্যাঁ, শীগ্‌গিরই একবার যাবার ইচ্ছে আছে। আচ্ছা, চললাম। যদি সময় পাই ওবেলা আপনাদের বাড়িতে যাব।'

ডাক্তার ক্ষুদ্র মোটরে চড়িয়া চলিয়া গেল। আমরা ব্যাঙ্কের দিকে চলিলাম। পথে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'ডাক্তার কলকাতা যাচ্ছে জানলে কি করে? তুমি কি আজকাল অন্তর্যামী হয়েছ নাকি?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'না। কিন্তু একজন ডাক্তার যখন বলে লম্বা কেস হাতে নেব না, অন্য ডাক্তারের কাছে যাও, তখন আন্দাজ করা যেতে পারে যে সে বাইরে যাবে।'

'কিন্তু কলকাতায়ই যাবে তার নিশ্চয়তা কি?'

'ওটা ডাক্তারের প্রফুল্লতা থেকে অনুমান করলাম।'

৮

ডাক্তারের ঔষধালয় হইতে অনতিদূরে ব্যাঙ্ক। আমরা গিয়া দেখিলাম ব্যাঙ্কের দ্বার খুলিয়াছে। দ্বারের দুই পাশে বন্দুক-কিরিচধারী দুইজন সান্ত্রী পাহারা দিতেছে।

বড় একটি ঘর দুই ভাগে বিভক্ত, মাঝে কাঠ ও কাচের অনুচ্চ বেড়া। বেড়ার গায়ে সারি সারি জানালা। এই জানালা দিয়া জনসাধারণের সঙ্গে ব্যাঙ্কের কর্মচারীদের লেন-দেন হইয়া থাকে।

ব্যোমকেশ একটি জানালার বাহিরে দাঁড়াইয়া চেক লিখিতেছে, দেখিলাম বেড়ার ভিতর দিকে ম্যানেজার অমরেশ রাহা দাঁড়াইয়া একজন কেরানীর সঙ্গে কথা কহিতেছেন। অমরেশ-বাবুও আমাদের দেখিতে পাইয়াছিলেন, তিনি স্মিতমুখে বাহিরে আসিলেন। বলিলেন, 'নমস্কার। ভাগ্যে আপনাদের দেখে ফেললাম নইলে তো টাকা নিয়েই চলে যেতেন।'

অমরেশবাবুকে চায়ের পার্টির পর আর দেখি নাই। তিনি সেজন্য লজ্জিত; ফ্রেঞ্চ-কাট দাড়িতে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন, 'রোজই মনে করি আপনাদের বাড়িতে যাব, কিন্তু একটা না একটা কাজ পড়ে যায়। ব্যাঙ্কের চাকরি মানে অষ্টপ্রহরের গোলামি!'

ব্যোমকেশ বলিল, 'এমন গোলামিতে সুখ আছে। হরদম টাকা নিয়ে নাড়াচাড়া করছেন।'

অমরেশবাবু করুণ মুখভঙ্গী করিয়া বলিলেন, 'সুখ আর কৈ ব্যোমকেশবাবু। চিনির বলদ চিনির বোঝা বয়ে মরে, কিন্তু দিনের শেষে খায় সেই ঘাস জল।'

ব্যোমকেশ চেকের বদলে টাকা পকেটস্থ করিলে অমরেশবাবু বলিলেন, 'চলুন, আজ

যখন পেয়েছি আপনাকে সহজে ছাড়ব না। আমার আপিস-ঘরে বসে খানিক গল্প-সল্প করা যাক। আপনার প্রতিভার যে পরিচয় অজিতবাবুর লেখা থেকে পাওয়া যায়, তাতে আপনাকে পেলে আর ছাড়তে ইচ্ছে করে না। আমাদের দেশে প্রতিভাবান মানুষের বড়ই অভাব।'

ভদ্রলোক শুধু যে ব্যোমকেশের প্রতি শ্রদ্ধাশীল তাহাই নয়, সাহিত্য-রসিকও বটে। সেদিন তাঁহার সহিত অধিক আলাপ করি নাই বলিয়া অনুতপ্ত হইলাম।

তিনি আমাদের ভিতরে লইয়া গেলেন। তাঁহার একটি নিজস্ব আপিস-ঘর আছে, তাহার দ্বার পর্যন্ত গিয়া তিনি বলিলেন, 'না, এখানে নয়। চলুন, ওপরে যাই। এখানে গণ্ডগোল, কাজের হুড়োহুড়ি। ওপরে বেশ নিরিবিলি হবে।'

আপিস-ঘরের দরজা খোলা ছিল; ভিতরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দেখিলাম, মামুলী টেবিল চেয়ার খাতাপত্র, কয়েকটা বড় বড় লোহার সিন্দুক ছাড়া আর কিছু নাই।

কাছেই সিঁড়ি। উপরে উঠিতে উঠিতে ব্যোমকেশ জিজ্ঞাসা করিল, 'ওপরতলাটা বুঝি আপনার কোয়ার্টার?'

'হ্যাঁ। ব্যাঙ্কেরও সুবিধে।'

'স্ত্রী-পুত্র পরিবার সব এখানেই থাকেন?'

'স্ত্রী-পুত্র পরিবার আমার নেই ব্যোমকেশবাবু। ভগবান সুমতি দিয়েছিলেন, বিয়ে করিনি। একলা-মানুষ, তাই ভদ্রভাবে চলে যায়। বিয়ে করলে হাড়ির হাল হত।'

উপরতলাটি একজন লোকের পক্ষে বেশ সুপরিসর। তিন চারটি ঘর, সামনে উন্মুক্ত ছাদ। অমরেশবাবু আমাদের বসিবার ঘরে লইয়া গিয়া বসাইলেন। অনাড়ম্বর পরিচ্ছন্ন ঘর; দেওয়ালে ছবি নাই, মেঝেয় গালিচা নাই। এক পাশে একটি জাজিম-ঢাকা চৌকি, দুই-তিনটি আরাম-কেদারা, একটি বইয়ের আলমারি। নিতান্তই মামুলী ব্যাপার, কিন্তু বেশ তৃপ্তিদায়ক। গৃহস্বামী যে গোছালো স্বভাবের লোক তাহা বোঝা যায়।

'বসুন, চা তৈরী করতে বলি।' বলিয়া তিনি প্রস্থান করিলেন।

বইয়ের আলমারিটা আমাকে আকর্ষণ করিতেছিল, উঠিয়া গিয়া বইগুলি দেখিলাম। অধিকাংশ বই গল্প উপন্যাস, চলন্তিকা আছে, সঞ্চয়িতা আছে। আমার রচিত ব্যোমকেশের উপন্যাসগুলিও আছে দেখিয়া পুলকিত হইলাম।

ব্যোমকেশও আসিয়া জুটিল। সে একখানা বই টানিয়া লইয়া পাতা খুলিল; দেখিলাম বইখানা বাংলা ভাষায় নয়, ভারতবর্ষেরই অন্য কোনও প্রদেশের লিপি। অনেকটা হিন্দীর মতন, কিন্তু ঠিক হিন্দী নয়।

এই সময় অমরেশবাবু ফিরিয়া আসিলেন। ব্যোমকেশ বলিল, 'আপনি গুজরাটী ভাষাও জানেন?'

অমরেশবাবু মুখে চট্‌কার শব্দ করিয়া বলিলেন, 'জানি আর কৈ? একসময় শেখবার চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু ও আমার দ্বারা হল না। বাঙালীর ছেলে মাতৃভাষা শিখতেই গলদ্‌ঘর্ম হয়, তার ওপর ইংরিজি আছে। উপরন্তু যদি একটা তৃতীয় ভাষা শিখতে হয় তাহলে আর বাঙালীর শক্তিতে কুলোয় না। অথচ শিখতে পারলে আমার উপকার হত। ব্যাঙ্কের কাজে গুজরাটী ভাষা জানা থাকলে অনেক সুবিধা হয়।'

আমরা আবার আসিয়া বসিলাম। দুই-চারিটি একথা সেকথার পর ব্যোমকেশ বলিল, 'ফাল্গুনী পাল মারা গেছে শুনেছেন বোধ হয়?'

অমরেশবাবু চেয়ার হইতে প্রায় লাফাইয়া উঠিলেন, 'অ্যাঁ। ফাল্গুনী পাল মারা গেছে! কবে—কোথায়—কি করে মারা গেল?'

ব্যোমকেশ ফাল্গুনীর মৃত্যু-বিবরণ বলিল। শুনিয়া অমরেশবাবু দুঃখিত ভাবে মাথা নাড়িয়া বলিলেন, 'আহা বেচারা! বড় দুঃখে পড়েছিল। কাল আমার কাছে এসেছিল।'

এবার আমাদের বিস্মিত হইবার পালা। ব্যোমকেশ বলিয়া উঠিল, 'কাল এসেছিল? কখন?'

অমরেশবাবু বলিলেন, 'সকালবেলা। কাল রবিবার ছিল, ব্যাংক বন্ধ; সবে চায়ের পেয়ালাটি নিয়ে বসেছি, ফাল্গুনী এসে হাজির, আমার ছবি এঁকেছে তাই দেখাতে এসেছিল—'

'ও—'

চাকর তিন পেয়ালা চা দিয়া গেল। তক্‌মা-আঁটা চাকর, বুঝিলাম ব্যাংকের পিওন; অবসরকালে বাড়ির কাজও করে। ভাবগতিক দেখিয়া মনে হইল অমরেশবাবু টাকা-পয়সার ব্যাপারে বিলক্ষণ হিসাবী।

ব্যোমকেশ চায়ের পেয়ালায় চামচ ঘুরাইতে ঘুরাইতে বলিল, 'ছবিখানা কিনলেন নাকি?'

অমরেশবাবু বিমর্ষ মুখভঙ্গী করিয়া বলিলেন, 'কিনতে হল। পাঁচ টাকা দিতে গেলাম কিছুতেই নিলে না, দশ টাকা আদায় করে ছাড়ল। এমন জানলে—'

ব্যোমকেশ চায়ে একটা চুমুক দিয়া বলিল, 'মৃত চিত্রকরের শেষ ছবি দেখবার ইচ্ছে হচ্ছে।'

'দেখুন না। ভালই এঁকেছে বোধ হয়। আমি অবশ্য ছবির কিছু বুঝি না—'

বইয়ের আলমারির নীচের দেরাজ হইতে একখণ্ড পুরু চতুষ্কোণ কাগজ আনিয়া তিনি আমাদের সম্মুখে ধরিলেন।

ফাল্গুনী ভাল ছবি আঁকিয়াছে; অমরেশবাবুর বিশেষত্বহীন চেহারাও উজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। ব্যোমকেশ চিত্রবিদ্যার একজন জহুরী, সে ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া ছবিটি দেখিতে লাগিল।

অমরেশবাবু আগে বেশ প্রফুল্লমুখে কথাবার্তা বলিতেছিলেন, কিন্তু ফাল্গুনীর মৃত্যু-সংবাদ শুনিবার পর কেমন যেন মুষড়াইয়া পড়িয়াছেন। প্রায় নীরবেই চা-পান শেষ হইল। পেয়ালা রাখিয়া অমরেশবাবু স্তিমিত স্বরে বলিলেন, 'ফাল্গুনীর কথায় মনে পড়ল, সেদিন চায়ের পার্টিতে শুনেছিলাম পিক্‌নিকের ফটোখানা চুরি গেছে। মনে আছে? তার কোনও হদিস পাওয়া গেল কিনা কে জানে।'

ব্যোমকেশ মগ্ন হইয়া ছবি দেখিতেছিল, উত্তর দিল না। আমিও কিছু বলা উচিত কিনা বুঝিতে না পারিয়া বোকার মত অমরেশবাবুর পানে চাহিয়া রহিলাম। অমরেশবাবু তখন নিজেই বলিলেন, 'সামান্য ব্যাপার, তাই ও নিয়ে বোধ হয় কেউ মাথা ঘামায়নি।'

ব্যোমকেশ ছবি নামাইয়া রাখিয়া একটা নিশ্বাস ফেলিল, 'চমৎকার ছবি। লোকটা যদি বেঁচে থাকত, আমিও ওকে দিয়ে ছবি আঁকিয়ে নিতাম। অমরেশবাবু, ছবিখানা যত্ন করে রাখবেন। আজ ফাল্গুনী পালের নাম কেউ জানে না, কিন্তু একদিন আসবে যেদিন ওর আঁকা ছবি সোনার দরে বিক্রি হবে।'

অমরেশবাবু একটু প্রফুল্ল হইয়া বলিলেন, 'তাই নাকি! তাহলে দশটা টাকা জলে পড়েনি? ছবিটা বাঁধিয়ে দেওয়ালে টাঙানো চলবে?'

'নিশ্চয়।'

অতঃপর আমরা গাত্রোত্থান করিলাম। অমরেশবাবু বলিলেন, 'আবার দেখা হবে। বছর শেষ হতে চলল, আমাকে আবার নববর্ষের ছুটিতে কলকাতায় গিয়ে হেড আপিসের কর্তাদের সঙ্গে দেখা করে আসতে হবে। এবার নববর্ষে দু'দিন ছুটি।'

'দু'দিন ছুটি কেন?'

'এবার একত্রিশে ডিসেম্বর রবিবার পড়েছে। শনিবার যদি অর্ধেক দিন ধরেন, তাহলে আড়াই দিন ছুটি পাওয়া যাবে। আপনারা এখনও কিছুদিন আছেন তো?'

'২রা জানুয়ারী পর্যন্ত আছি বোধ হয়।'

'আচ্ছা, নমস্কার।'

আমরা বাহির হইলাম। ব্যাংকের ভিতর দিয়া নামিতে হইল না, বাড়ির পিছনদিকে একটা খিড়কি-সিঁড়ি ছিল, সেই পথে নামিয়া রাস্তায় আসিলাম। বাজারের মধ্য দিয়া যাইতে যাইতে হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল সিগারেট ফুরাইয়াছে। বলিলাম, 'এস, এক টিন সিগারেট কিনতে হবে।'

ব্যোমকেশ অন্যমনস্ক ছিল, চমকিয়া উঠিল। বলিল, 'আরে তাই তো! আমাকেও একটা জিনিস কিনতে হবে।'

একটা বড় মনিহারীর দোকানে ঢুকিলাম। আমি একদিকে সিগারেট কিনিতে গেলাম, ব্যোমকেশ অন্যদিকে গেল। আমি সিগারেট কিনিতে কিনিতে আড়চোখে দেখিলাম ব্যোমকেশ একটা দামী এসেন্সের শিশি কিনিয়া পকেটে পুরিল।

মনে মনে হাসিলাম। ইহারা কেন যে ঝগড়া করে, কেনই বা ভাব করে কিছু বুঝি না। দাম্পত্য-জীবন আমার কাছে একটা হাস্যকর প্রহেলিকা।

সেদিন দুপুরবেলা আহারাদির পর একটু বিশ্রাম করিবার জন্য বিছানায় লম্বা হইয়াছিলাম, ঘুম ভাঙিয়া দেখি বেলা সাড়ে তিনটা।

ব্যোমকেশের ঘর হইতে মৃদু জল্পনার শব্দ আসিতেছিল; উঁকি মারিয়া দেখিলাম ব্যোমকেশ চেয়ারে বসিয়াছে এবং সত্যবতী তাহার পিছনে দাঁড়াইয়া দুই হাতে তাহার গলা জড়াইয়া কানে কানে কি সব বলিতেছে। দু'জনের মুখেই হাসি।

সরিয়া আসিয়া উচ্চকণ্ঠে বলিলাম, 'ওহে কপোত-কপোতী, তোমাদের কূজন-গুঞ্জন শেষ হতে যদি দেরি থাকে তাহলে না হয় আমিই চায়ের ব্যবস্থা করি।'

সত্যবতী সলজ্জভাবে মুখের খানিকটা আঁচলের আড়াল দিয়া বাহির হইয়া আসিল এবং রান্নাঘরের দিকে চলিয়া গেল। খানিক পরে ব্যোমকেশ জ্বলন্ত সিগারেট হইতে ধোঁয়া ছাড়িতে ছাড়িতে বাহির হইল। অবাক হইয়া বলিলাম, 'ব্যাপার কি! ইঞ্জিনের মত ধোঁয়া ছাড়ছ যে।'

ব্যোমকেশ একগাল হাসিয়া বলিল, 'পারমিশান পেয়ে গেছি। আজ থেকে যত ইচ্ছে!'

বুঝিলাম দাম্পত্য-জীবনে কেবল প্রেম থাকিলেই চলে না, কূটবুদ্ধিরও প্রয়োজন।

৯

চা পান করিয়া উপরতলায় রোগিণীর সংবাদ লইতে গেলাম। সামাজিক কর্তব্য পালন না করিলে নয়।

অধ্যাপক সোমের মুখ চিন্তাক্রান্ত। মালতী দেবীর অবস্থা খুবই খারাপ, তবে একেবারে হাল ছাড়িয়া দিবার মত নয়। দুটা ফুসফুসই আক্রান্ত হইয়াছে, অক্সিজেন দেওয়া হইতেছে। জ্বর খুব বেশী রোগিণী মাঝে মাঝে ভুল বকিতেছেন। একজন নার্সকে সেবার জন্য নিয়োগ করা হইয়াছে।

স্বখাত সলিল। সহানুভূতি জানাইয়া ফিরিয়া আসিলাম।

নীচে নামিয়া আসিবার কিছুক্ষণ পরে ডাক্তার ঘটক আসিল।

এবেলা ডাক্তারের ভাবভঙ্গী অন্য প্রকার। একটু সতর্ক, একটু সন্দিগ্ধ, একটু অন্তঃপ্রবিষ্ট। ব্যোমকেশের পানে মাঝে মাঝে এমনভাবে তাকাইতেছে যেন ব্যোমকেশ সম্বন্ধে তাহার মনে কোনও সংশয় উপস্থিত হইয়াছে।

কথাবার্তা সাধারণ ভাবেই হইল। ডাক্তার সকালে মহীধরবাবুর বাড়িতে গিয়া ফাল্গুনীর লাস দেখিয়াছিল, সেই কথা বলিল। ব্যোমকেশ জিজ্ঞাসা করিল, 'কি দেখলেন? মৃত্যুর কারণ জানা গেল?'

ডাক্তার একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, 'অটপ্সি না হওয়া পর্যন্ত জোর করে কিছু বলা যায় না।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'তবু আপনি ডাক্তার, আপনি কি কিছুই বুঝতে পারলেন না?'

ইতস্তত করিয়া ডাক্তার বলিল, 'না।'

ব্যোমকেশ তখন বলিল, 'ও কথা যাক। মহীধরবাবু কেমন আছেন? কাল বিকেলে আমরা তাঁকে দেখতে গিয়েছিলাম; কিন্তু ডাকাডাকি করেও কারুর সাড়া পাওয়া গেল

না, তাই ফিরে এলাম।'

ডাক্তার সতর্ক ভাবে প্রশ্ন করিল, 'ক'টার সময় গিয়েছিলেন?'

'আন্দাজ পাঁচটার সময়।'

ডাক্তার একটু ভাবিয়া বলিল, 'কি জানি। আমিও বিকেলবেলা গিয়েছিলাম, কিন্তু পাঁচটার আগে ফিরে এসেছিলাম। মহীধরবাবু ভালই আছেন। তবে আজকে বাড়িতে এই ব্যাপার হল—একটা শক্ পেয়েছেন।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'আর রজনী দেবী! তিনি কেমন আছেন?'

ডাক্তারের মুখের উপর দিয়া একটা রক্তাভা খেলিয়া গেল। কিন্তু সে ধীরে ধীরে বলিল, 'রজনী দেবী ভালই আছেন। তাঁর অসুখ করেছে এমন কথা তো শুনিনি। আচ্ছা, আজ উঠি।'

ডাক্তার উঠিল। আমরাও উঠিলাম। দ্বার পর্যন্ত আসিয়া ব্যোমকেশ বলিল, 'আপনার কলকাতা যাওয়া তাহলে স্থির?'

ডাক্তার ফিরিয়া দাঁড়াইল, তাহার চোখ দুটা সহসা জ্বলিয়া উঠিল। সে দাঁতে দাঁত চাপিয়া বলিল, 'ব্যোমকেশবাবু, আপনি এখানে শরীর সারাতে এসেছেন, গোয়েন্দাগিরি করতে নয়। যা আপনার এলাকার বাইরে তা নিয়ে মাথা ঘামাবেন না।' বলিয়া গট্ গট্ করিয়া বাহির হইয়া গেল।

আমরা ফিরিয়া আসিয়া বসিলাম। ব্যোমকেশ সিগারেট ধরাইতে ধরাইতে বলিল, 'ডাক্তার ঘটক এমনিতে খুব ভালমানুষ, কিন্তু ল্যাজে পা পড়লে একেবারে কেউটে সাপ।'

বাইরে মোটর-বাইকের ফট্ ফট্ শব্দ আসিয়া থামিল। ব্যোমকেশ লাফাইয়া উঠিয়া বলিল, 'আরে পাণ্ডে সাহেব এসেছেন। ভালই হল।'

পাণ্ডে প্রবেশ করিলেন। ক্লান্ত হাসিয়া বলিলেন, 'ব্যোমকেশবাবু, আপনার কথা ফলে গেল। পরী উদ্ধার করেছি।'

ব্যোমকেশ তাঁহাকে চেয়ার দিয়া বলিল, 'বসুন। কোথা থেকে পরী উদ্ধার করলেন?'

'মহীধরবাবুর কুয়ো থেকে। ফাল্গুনীর লাস বেরুবার পর কুয়োয় ডুবুরি নামিয়েছিলাম। উষানাথবাবুর পরী বেরিয়েছে।'

ব্যোমকেশ কিছুক্ষণ চক্ষু কুঞ্চিত করিয়া থাকিয়া বলিল, 'আর কিছু?'

'আর কিছু না।'

'পোস্ট-মর্টেম রিপোর্ট পেয়েছেন?'

'পেয়েছি। ফাল্গুনী জলে ডুবে মরেনি, মৃত্যুর পর তাকে জলে ফেলে দেওয়া হয়েছিল।'

'হুঁ। অর্থাৎ কাল রাত্রে তাকে কেউ খুন করেছে। তারপর মৃতদেহটা কুয়োয় ফেলে দিয়েছে। আত্মহত্যা নয়।'

'তাই তো মনে হচ্ছে। কিন্তু ফাল্গুনীর মতন একটা অপদার্থ লোককে খুন করে কার কি লাভ?'

'লাভ নিশ্চয় আছে, নইলে খুন করবে কেন? অপদার্থ লোক যদি কোনও সাংঘাতিক গুপ্তকথা জানতে পারে তাহলে তার বেঁচে থাকা কারুর কারুর পক্ষে বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে। ফাল্গুনী অপদার্থ ছিল বটে, কিন্তু নির্বোধ ছিল না।'

পাণ্ডে বিরস মুখে বলিলেন, 'তা বটে। কিন্তু আমি ভাবছি, পরীটা কুয়োর মধ্যে এল কি করে? তবে কি ফাল্গুনীই পরী চুরি করেছিল? খুনীর সঙ্গে ফাল্গুনীর কি পরী নিয়ে মারামারি কাড়াকাড়ি হয়েছিল? তারপর খুনী ফাল্গুনীকে ঠেলে কুয়োয় ফেলে দিয়েছে?—কিন্তু পরীটা তো এমন কিছু দামী জিনিস নয়।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'ভাল কথা, ফাল্গুনীর গায়ে কি কোনও আঘাত-চিহ্ন পাওয়া গেছে?'

'না। কিন্তু তার পেটে অনেকখানি আফিম পাওয়া গেছে। মদের সঙ্গে আফিম মেশান ছিল।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'বুঝেছি। দেখুন, কি করে ফাল্গুনীর মৃত্যু হল সেটা বড় কথা নয়, কেন মৃত্যু হল সেইটেই আসল কথা।'

পাণ্ডে উৎসুক চক্ষে চাহিয়া বলিলেন, 'এ বিষয়ে আপনি কি কিছু বুঝেছেন ব্যোমকেশবাবু?'

ব্যোমকেশ মৃদু হাসিয়া বলিল, 'বোধ হয় কিছু কিছু বুঝেছি। আপনাকে আমার অনেক কথা বলবার আছে। কিন্তু আপনার শোনবার সময় হবে কি?'

পাণ্ডে ব্যোমকেশের হাত ধরিয়া দ্বারের দিকে টানিয়া লইয়া চলিলেন। বলিলেন, 'সময় হবে কিনা দেখাচ্ছি। চলুন আমার বাড়িতে, একেবারে রাত্রির খাওয়া-দাওয়া সেরে ফিরবেন।'

পাণ্ডে ব্যোমকেশকে লইয়া চলিয়া গেলেন।

আমি আর সত্যবতী রাত্রি সাড়ে নয়টা পর্যন্ত তাস লইয়া গোলামচোর খেলিলাম। ব্যোমকেশ ফিরিলে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কি হল এতক্ষণ ধরে?'

ব্যোমকেশ স্বর্গীয় হাস্য করিয়া বলিল, 'আঃ, মুর্গিটা যা রেঁধেছিল!'

ধমক দিয়া বলিলাম, 'কথা চাপা দিও না। পাঁচ ঘণ্টা ধরে কি কথা হল?'

ব্যোমকেশ জিভ কাটিল, 'পুলিসের গুপ্তকথা কি বলতে আছে? তবে এমন কোনও কথা হয়নি যা তুমি জান না।'

'হত্যাকারী কে?'

'পাঁচকড়ি দে।' বলিয়া ব্যোমকেশ সুট করিয়া শয়নকক্ষে ঢুকিয়া পড়িল।

১০

বড়দিন আসিয়া চলিয়া গিয়াছে; নববর্ষ সমাগতপ্রায়। এখানে বড়দিন ও নববর্ষের উৎসবে বিশেষ হৈ চৈ হয় না, সাহেব-মেমেরা হুইস্কি খাইয়া একটু নাচানাচি করে এই পর্যন্ত।

এ কয়দিনে নূতন কোনও পরিস্থিতির উদ্ভব হয় নাই। মালতী দেবীর রোগ ভালর দিকেই আসিতেছিল; কিন্তু তিনি একটু সংবিৎ পাইয়া দেখিলেন ঘরে যুবতী নার্স রহিয়াছে। অমনি তাঁহার ষষ্ঠ রিপু প্রবল হইয়া উঠিল, তিনি গালাগালি দিয়া নার্সকে তাড়াইয়া দিলেন। ফলে অবস্থা আবার যায়-যায় হইয়া উঠিয়াছে, অধ্যাপক সোম একা হিমসিম খাইতেছেন।

শনিবার ৩০শে ডিসেম্বর সকালবেলা ব্যোমকেশ বলিল, 'চল, আজ একটু রোদে বেরুনো যাক।'

রিক্‌শা চড়িয়া বাহির হইলাম।

প্রথমে উপস্থিত হইলাম নকুলেশবাবুর ফটোগ্রাফির দোকানে। নীচে দোকান, উপর-তলায় নকুলেশবাবুর বাসস্থান। তিনি উপরে ছিলেন আমাদের দেখিয়া যেন একটু বিব্রত হইয়া পড়িলেন। মনে হইল তিনি বাঁধাছাঁদা করিতেছিলেন; কাষ্ঠ হাসিয়া বলিলেন, 'আসুন—ছবি তোলাবেন নাকি?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'এখন নয়। এদিক দিয়ে যাচ্ছিলাম, ভাবলাম আপনার দোকানটা দেখে যাই।'

নকুলেশবাবু বলিলেন, 'বেশ বেশ। আমি কিন্তু ভাল ছবি তুলি। এখানকার কেষ্ট-বিষ্টু সকলেই আমাকে দিয়ে ছবি তুলিয়েছেন। এই দেখুন না।'

ঘরের দেয়ালে অনেকগুলি ছবি টাঙানো রহিয়াছে; তন্মধ্যে চেনা লোক মহীধরবাবু এবং অধ্যাপক সোম। ব্যোমকেশ দেখিয়া বলিল, 'বাঃ, বেশ ছবি। আপনি দেখছি একজন সত্যিকারের শিল্পী।'

নকুলেশবাবু খুশী হইয়া বলিলেন, 'হেঁ হেঁ। ওরে লালু, পাশের দোকান থেকে দু' পেয়ালা চা নিয়ে আয়।'

'চায়ের দরকার নেই, আমরা খেয়ে-দেয়ে বেরিয়েছি। আপনি কোথাও যাবেন মনে

হচ্ছে।'

নকুলেশবাবু বলিলেন, 'হ্যাঁ, দু' দিনের জন্য একবার কলকাতা যাব। বৌ-ছেলে কলকাতায় আছে, তাদের আনতে যাচ্ছি।'

'আচ্ছা, আপনি গোছগাছ করুন।'

রিক্‌শাতে চড়িয়া ব্যোমকেশ বলিল, 'স্টেশনে চল।'

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'ব্যাপার কি? সবাই জোট বেঁধে কলকাতা যাচ্ছে!'

ব্যোমকেশ বলিল, 'এই সময় কলকাতার একটা নিদারুণ আকর্ষণ আছে।'

রেলওয়ে স্টেশনে উপস্থিত হইলাম। ব্রাঞ্চ লাইনের প্রান্তীয় স্টেশন, বেশী বড় নয়। এখান হইতে বড় জংশন প্রায় পঁচিশ মাইল দূরে, সেখানে নামিয়া মেন লাইনের গাড়ি ধরিতে হয়। রেল ছাড়া জংশনে যাইবার মোটর-রাস্তাও আছে; সাহেব সুবা এবং যাহাদের মোটর আছে তাহারা সেই পথে যায়।

ব্যোমকেশ কিন্তু স্টেশনে নামিল না, রিক্‌শাওয়ালাকে ইশারা করিতেই সে গাড়ি ঘুরাইয়া বাহিরে লইয়া চলিল। জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কি হল, নামলে না?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'তুমি বোধ হয় লক্ষ্য করনি, টিকিট-ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে ডাক্তার ঘটক টিকিট কিনছিল।'

'তাই নাকি?' আমি ব্যোমকেশকে আরও কয়েকটা প্রশ্ন করিলাম, কিন্তু সে যেন শুনিতে পায় নাই এমনি ভান করিয়া উত্তর দিল না।

বাজারের ভিতর দিয়া যাইতে যাইতে বড় মনিহারীর দোকানটার সামনে একটা মোটর দাঁড়াইয়া আছে দেখিলাম। ব্যোমকেশ রিক্‌শা থামাইয়া নামিল, আমিও নামিলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম, 'আবার কি মতলব? আরও এসেন্স চাই নাকি?'

সে হাসিয়া বলিল, 'আরে না না—'

'তবে কি কেশতৈল? তরল আলতা?'

'এসই না।'

দোকানে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম ডেপুটি ঊষানাথবাবু রহিয়াছেন। তিনি একটা চামড়ার সুটকেস কিনিতেছেন। আমার মুখ দিয়া আপনিই বাহির হইয়া গেল, 'আপনিও কি কলকাতা যাচ্ছেন নাকি?'

ঊষানাথবাবু চমকিত হইয়া বলিলেন, 'আমি! নাঃ, আমি ট্রেজারি অফিসার, আমার কি স্টেশন ছাড়বার জো আছে? কে বললে আমি কলকাতা যাচ্ছি?' তাঁহার স্বর কড়া হইয়া উঠিল।

ব্যোমকেশ সান্ত্বনার সুরে বলিল, 'কেউ বলেনি। আপনি সুটকেস কিনছেন দেখে অজিত ভেবেছিল—। যাক, আপনার পরী পেয়েছেন তো?'

'হ্যাঁ, পেয়েছি।' ঊষানাথবাবু অসন্তুষ্ট ভাবে মুখ ফিরাইয়া লইয়া দোকানদারের সহিত কথা কহিতে লাগিলেন।

আমরা ফিরিয়া গিয়া রিক্‌শাতে চড়িলাম। বলিলাম, 'কি হল? হুজুর হঠাৎ চটলেন কেন?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'কি জানি। ওঁর হয়তো মনে মনে কলকাতা যাবার ইচ্ছে, কিন্তু কর্তব্যের দায়ে স্টেশন ছাড়তে পারছেন না, তাই মেজাজ গরম। কিংবা—'

রিক্‌শাওয়ালা জিজ্ঞাসা করিল, 'আভি কিধর্ যানা হ্যায়?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'ডি.এস.পি পাণ্ডে সাহেব।'

পাণ্ডে সাহেবের বাড়িতেই আপিস। তিনি আমাদের স্বাগত করিলেন। ব্যোমকেশ প্রশ্ন করিল, 'সব ঠিক?'

পাণ্ডে বলিলেন, 'সব ঠিক।'

'ট্রেন কখন?'

'রাত্রি সাড়ে দশটায়। সওয়া এগারটায় জংশন পেঁছিবে।'

'কলকাতার ট্রেন কখন?'

'পৌনে বারটায়।'

'আর পশ্চিমের মেল?'

'এগারটা পঁয়ত্রিশ।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'বেশ। তাহলে ওবেলা আন্দাজ পাঁচটার সময় আমি মহীধরবাবুর বাড়িতে যাব। আপনি সাড়ে পাঁচটার সময় যাবেন। মহীধরবাবু যদি আমার অনুরোধ না রাখেন, পুলিসের অনুরোধ নিশ্চয় অগ্রাহ্য করতে পারবেন না।'

গম্ভীর হাসিয়া পাণ্ডে বলিলেন, 'আমারও তাই বিশ্বাস।'

ইহাদের টেলিগ্রাফে কথাবার্তা হৃদয়ঙ্গম হইল না। কিন্তু প্রশ্ন করিয়া লাভ নাই; জানি প্রশ্ন করিলেই ব্যোমকেশ জিভ কাটিয়া বলিবে—পুলিসের গুপ্তকথা।

পাণ্ডের আপিস হইতে ব্যাঙ্কে গেলাম। কিছু টাকা বাহির করিবার ছিল।

ব্যাঙ্কে খুব ভিড়; আগামী দুই দিন বন্ধ থাকিবে। তবু ক্ষণেকের জন্য অমরেশবাবুর সঙ্গে দেখা হইল। তিনি বলিলেন, 'এই বেলা যা দরকার টাকা বার করে নিন। কাল পরশু ব্যাঙ্ক বন্ধ থাকবে।'

ব্যোমকেশ জিজ্ঞাসা করিল, 'আপনি ফিরছেন কবে?'

'পরশু রাত্রেই ফিরব।'

কাজের সময়, একজন কেরানী তাঁহাকে ডাকিয়া লইয়া গেল। আমরা টাকা বাহির করিয়া ফিরিতেছি, দেখিলাম ডাক্তার ঘটক ব্যাঙ্কে প্রবেশ করিল। সে আমাদের দেখিতে পাইয়াছিল, কিন্তু যেন দেখিতে পায় নাই এমনি ভাবে গিয়া একটা জানালার সম্মুখে দাঁড়াইল।

ব্যোমকেশ আমার দিকে চাহিয়া সহাস্য চক্ষুর্দ্বয় ঈষৎ কুঞ্চিত করিল। তারপর রিক্‌শাতে চড়িয়া বসিয়া বলিল, 'ঘর চলো।'

১১

অপরাহ্ণ পাঁচটার সময় আমি আর ব্যোমকেশ মহীধরবাবুর বাড়িতে উপস্থিত হইলাম। তিনি বসিবার ঘরে ছিলেন। দেখিলাম তাঁহার চেহারা খারাপ হইয়া গিয়াছে। মুখের ফুটি-ফাটা হাসিটি ম্রিয়মাণ, চালতার মতন গাল দুইটি ঝুলিয়া পড়িয়াছে।

বলিলেন, 'আসুন আসুন। অনেক দিন বাঁচবেন, ব্যোমকেশবাবু, এইমাত্র আপনার কথা ভাবছিলাম। শরীর বেশ সেরে উঠেছে দেখছি। বাঃ, বেশ বেশ।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'কিন্তু আপনার শরীর তো ভাল দেখছি না।'

মহীধরবাবু বলিলেন, 'হয়েছিল একটু শরীর খারাপ—এখন ভালই। কিন্তু একটা বড় ভাবনার কারণ হয়েছে ব্যোমকেশবাবু।'

'কি হয়েছে?'

'রজনী কাল রাত্রে কলকাতা চলে গেছে।'

'সে কি! একলা গেছেন? আপনাকে না বলে?'

'না না, সে সব কিছু নয়। বাড়ির পুরোনো চাকর রামদীনকে তার সঙ্গে দিয়েছি।'

'তবে ভাবনাটা কিসের?'

মহীধরবাবুর মনে ছল চাতুরী নাই। সোজাসুজি বলিতে আরম্ভ করিলেন, 'শুনুন, বলি তাহলে। কলকাতায় রজনীর এক মাসী থাকেন, তিনিই ওকে মানুষ করেছেন। কাল বিকেলে ওর মেসোর এক 'তার' এল। তিনি রজনীকে ডেকে পাঠিয়েছেন—মাসীর ভারি অসুখ। রজনীকে রাত্তিরের গাড়িতে পাঠিয়ে দিলাম। ও এমন প্রায়ই যাতায়াত করে, পাঁচ ছ' ঘণ্টার রাস্তা বৈ তো নয়। রজনী আজ সকালে কলকাতায় পৌঁছে গেছে, 'তার' পেয়েছি।

'এ পর্যন্ত কোনও গোলমাল নেই। তারপর শুনুন। আজ সকালে দু'খানা চিঠি পেলাম; তার মধ্যে একখানা রজনীর মাসীর হাতের লেখা—কালকের তারিখ। তিনি নিতান্ত মামুলী চিঠি লিখেছেন, অসুখ-বিসুখের কোনও কথাই নেই।'

মহীধরবাবু শঙ্কিত চক্ষে ব্যোমকেশের পানে চাহিলেন। ব্যোমকেশ বলিল, 'এমনও তো হতে পারে চিঠি লেখবার পর তিনি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন।'

মহীধরবাবু বলিলেন, 'তা একেবারে অসম্ভব নয়। কিন্তু অন্য চিঠিখানার কথা এখনও বলিনি। বেনামী চিঠি। এই পড়ে দেখুন।'

তিনি একটি খাম ব্যোমকেশকে দিলেন। খামের উপর ডাকঘরের ছাপ দেখিয়া বোঝা যায় এই শহরেই ডাকে দেওয়া হইয়াছে। ব্যোমকেশ চিঠি বাহির করিয়া পড়িল। সাদা এক তক্তা কাগজের উপর মাত্র কয়েকটি কথা লেখা ছিল—

আপনার চোখের আড়ালে একজন ভদ্রবেশী দুষ্ট লোক আপনার কন্যার সহিত অবৈধ প্রণয়ে লিপ্ত হইয়াছে। ইহারা যদি ইলোপ করে, কেলেঙ্কারীর একশেষ হইবে। সাবধান! ডাক্তার ঘটককে বিশ্বাস করিবেন না।

ব্যোমকেশ চিঠি পড়িয়া ফেরত দিল। মহীধরবাবু কম্পিত স্বরে বলিলেন, 'কে লিখেছে জানি না। কিন্তু এ যদি সত্যি হয়—'

ব্যোমকেশ শান্তভাবে বলিল, 'ডাক্তার ঘটককে আপনি জানেন। সে এমন কাজ করবে বলে আপনার মনে হয়?'

মহীধরবাবু ইতস্তত করিয়া বলিলেন, 'ডাক্তারকে তো ভাল ছেলে বলেই জানি; যখন তখন আসে আমার বাড়িতে। তবে পরচিত্ত অন্ধকার। আচ্ছা, সে কি আছে এখানে?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'আছে। আজ সকালেই তাকে দেখেছি।'

মহীধরবাবু স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, 'আছে? যাক, তাহলে বোধ হয় কেউ মিথ্যে বেনামী চিঠি দিয়েছে।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'ডাক্তার কিন্তু আজ রাত্রে কলকাতা যাচ্ছে।'

মহীধরবাবু আবার ব্যাকুল হইয়া বলিলেন, 'আঁ—যাচ্ছে! তবে—?'

ব্যোমকেশ দৃঢ় স্বরে বলিল, 'মহীধরবাবু, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, কোনও কেলেঙ্কারী হবে না। আপনি মিথ্যে ভয় করছেন।'

মহীধরবাবু ব্যোমকেশের হাত ধরিয়া বলিলেন, 'সত্যি বলছেন? কিন্তু আপনি কি করে জানলেন—আপনি তো—'

ব্যোমকেশ বলিল, 'আমি এমন অনেক কথা জানি যা আপনি জানেন না। আমাকে বিশ্বাস করুন, আমি আপনাকে মিথ্যে আশ্বাস দিচ্ছি না। রজনী দেবী দু'দিন পরেই ফিরে আসবেন। তিনি এমন কোনও কাজ করবেন না যাতে আপনার মাথা হেঁট হয়।'

মহীধরবাবু গদ্‌গদ স্বরে বলিলেন, 'ব্যস, তা হলেই হল। ধন্যবাদ ব্যোমকেশবাবু। আপনার কথায় যে কত দূর নিশ্চিন্ত হলাম তা বলতে পারি না। বুড়ো হয়েছি—ভগবান একবার দাগা দিয়েছেন—তাই একটুতেই ভয় হয়।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'ওকথা ভুলে যান। আমি এসেছি আপনার কাছে একটা অনুরোধ নিয়ে।'

মহীধরবাবু ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, 'বলুন বলুন।'

'আপনার মোটরখানা আজ রাত্রে একবার দিতে হবে। জংশনে যাব। একটু জরুরী কাজ আছে।'

'এ আর বেশী কথা কি? কখন চাই বলুন?'

'রাত্রি ন'টার সময়।'

'বেশ, ঠিক ন'টার সময় আমার গাড়ি আপনার বাড়ির সামনে হাজির থাকবে। আর কিছু?'

'আর কিছু না।'

এই সময় পাণ্ডে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সকলে মিলিয়া চা ও প্রচুর জলখাবার ধ্বংস করিয়া বাড়ি ফিরিলাম।

ঠিক ন'টার সময় মহীধরবাবুর আট সিলিন্ডার গাড়ি আমাদের বাড়ির সামনে আসিয়া থামিল। আমি, ব্যোমকেশ ও পাণ্ডে সাহেব তাহাতে চাপিয়া বসিলাম। গাড়ি ছাড়িয়া দিল। একটি কালো রঙের পুলিস ভ্যান আগে হইতেই দাঁড়াইয়াছিল, সেটি আমাদের পিছু লইল।

শহরের সীমানা অতিক্রম করিয়া আমাদের মোটর জংশনের দীর্ঘ গৃহহীন পথ ধরিল। দুই পাশে কেবল বড় বড় গাছ; আমাদের গাড়ি তাহার ভিতর আলোর সুড়ঙ্গ রচনা করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে।

পথে বেশী কথা হইল না। তিনজনে পাশাপাশি বসিয়া একটার পর একটা সিগারেট টানিয়া চলিয়াছি। একবার ব্যোমকেশ বলিল, 'আপনার আসামী ফার্স্ট ক্লাসের টিকিট কিনবে।'

'হ্যাঁ। আমারও তাই মনে হয়। যে ক্লাসেই উঠুক, ইনস্পেক্টর দুবে পাশের কামরায় থাকবে।'

'পুলিস মহলে আসল কথা কে কে জানে?'

'আমি আর দুবে। পাছে আগে থাকতে বেশী হৈ চৈ হয় তাই চুপিসাড়ে মহীধর-বাবুর গাড়ি নিতে হল। পিছনের ভ্যানে যারা আছে তারাও জানে না কি জন্যে কোথায় যাচ্ছি। পুলিসের থানা থেকে যত কথা বেরোয় এত আর কোথাও থেকে নয়। ঘুষখোর পুলিস তো আছেই। তা ছাড়া পুলিসের পেটে কথা থাকে না।'

পুরন্দর পাণ্ডে নির্মলচরিত্র পুরুষ, তাই স্বজাতি সম্বন্ধেও তিনি সত্যবাদী।

দশটার সময় জংশনে পৌঁছিলাম। লাল সবুজ অসংখ্য আকাশ-প্রদীপে স্টেশন ঝলমল করিতেছে।

পুলিসের ভ্যানে দুইজন সাব-ইন্‌স্পেক্টর ও কয়েকটি কনস্টেবল ছিল। পাণ্ডে তাহাদের স্টেশনের ভিতরে বাহিরে নানা স্থানে সন্নিবিষ্ট করিলেন; তারপর স্টেশন-মাস্টারের সঙ্গে দেখা করিলেন। বলিলেন, 'আমার একটা 'লগ' আসবার কথা আছে। এলেই খবর দেবেন। আমরা ওয়েটিং রুমে আছি।'

আমরা তিন জনে ফার্স্ট ক্লাস ওয়েটিং রুমে গিয়া বসিলাম। পাণ্ডে ঘন ঘন হাতঘড়ি দেখিতে লাগিলেন।

ঠিক সাড়ে দশটার সময় স্টেশনমাস্টার খবর দিলেন, ''লগ' এসেছে। সব ভাল। ফার্স্ট ক্লাস।'

এখনও পঁয়তাল্লিশ মিনিট।

কিন্তু পঁয়তাল্লিশ মিনিট সময় যত দীর্ঘই হোক, প্রাকৃতিক নিয়মে শেষ হইতে বাধ্য। গাড়ি আসার ঘণ্টা বাজিল। আমরা প্ল্যাটফর্মে গিয়া দাঁড়াইলাম। আমাদের সকলের গায়ে ওভারকোট এবং মাথায় পশমের টুপি, সুতরাং সহসা দেখিয়া কেহ যে চিনিয়া ফেলিবে সে সম্ভাবনা নাই।

তারপর বহু প্রতীক্ষিত গাড়ি আসিয়া দাঁড়াইল।

পাণ্ডে সাহেব নাটকের রঙ্গমঞ্চ ভালই নির্বাচন করিয়াছিলেন। আয়োজনেরও কিছু ত্রুটি রাখেন নাই; কিন্তু তবু নাটক জমিতে পাইল না, পটোত্তোলনের সঙ্গে সঙ্গে যবনিকা পড়িয়া গেল।

গাড়ির প্রথম শ্রেণীর কামরা যেখানে থামে আমরা সেইখানে দাঁড়াইয়াছিলাম। ঠিক আমাদের সামনে প্রথম শ্রেণীর কামরা দেখা গেল। জানালাগুলির কাঠের কবাট বন্ধ, তাই অভ্যন্তরভাগ দেখা গেল না। অল্পকাল-মধ্যে দরজা খুলিয়া গেল। একজন কুলি ছুটিয়া গিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল এবং দুইটি বড় বড় চামড়ার সুটকেস নামাইয়া রাখিল।

কামরায় একটি মাত্র যাত্রী ছিলেন, তিনি এবার বাহির হইয়া আসিলেন। কোটপ্যাণ্ট-পরা অপরিচিত ভদ্রলোক, গোঁফ দাড়ি কামানো, চোখে ফিকা নীল চশমা। তিনি সুটকেস

দুটি কুলির মাথায় তুলিবার ব্যবস্থা করিতেছেন, পাণ্ডে এবং ব্যোমকেশ তাঁহার দুই পাশে গিয়া দাঁড়াইল। ব্যোমকেশ একটু দুঃখিত স্বরে বলিল, 'অমরেশবাবু, আপনার যাওয়া হল না। ফিরে যেতে হবে।'

অমরেশবাবু! ব্যাঙ্কের ম্যানেজার অমরেশ রাহা! গোঁফদাড়ি কামানো মুখ দেখিয়া একেবারে চিনিতে পারি নাই।

অমরেশ রাহা একবার দক্ষিণে একবার বামে ঘাড় ফিরাইলেন, তারপর ক্ষিপ্রহস্তে পকেট হইতে পিস্তল বাহির করিয়া নিজের কপালে ঠেকাইয়া ঘোড়া টানিলেন। চড়াৎ করিয়া শব্দ হইল।

মুহূর্ত-মধ্যে অমরেশ রাহার ভূপতিত দেহ ঘিরিয়া লোক জমিয়া গেল। পাণ্ডে হুইসল বাজাইলেন; সঙ্গে সঙ্গে পুলিসের বহু লোক আসিয়া স্থানটা ঘিরিয়া ফেলিল। পাণ্ডে কড়া সুরে বলিলেন, 'ইন্‌স্পেক্টর দুবে, সুটকেস দুটো আপনার জিম্মায়।'

একজন লোক ভিড় ঠেলিয়া প্রবেশ করিল। চিনিলাম, ডাক্তার ঘটক। সে বলিল, 'কি হয়েছে? এ কে?'

পাণ্ডে বলিলেন, 'অমরেশ রাহা। দেখুন তো বেঁচে আছে কি না।'

ডাক্তার ঘটক নত হইয়া দেহ পরীক্ষা করিল, তারপর উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, 'মারা গেছে।'

ভিড়ের ভিতর হইতে দন্তবাদ্যসহযোগে একটা বিস্ময়-কুতূহলী স্বর শোনা গেল, 'অমরেশ রাহা মারা গেছে—অ্যাঁ! কি হয়েছিল? তার দাড়ি কোথায়—অ্যাঁ—!'

ফটোগ্রাফার নকুলেশ সরকার।

ডাক্তার ঘটক ও নকুলেশবাবুকে লক্ষ্য করিয়া ব্যোমকেশ বলিল, 'আপনাদের গাড়িও এসে পড়েছে। এখন বলবার সময় নেই, ফিরে এসে শুনবেন।'

১২

ব্যোমকেশ বলিল, 'একটা সাংঘাতিক ভুল করেছিলাম। অমরেশ রাহা ব্যাঙ্কের ম্যানেজার, তার যে পিস্তলের লাইসেন্স থাকতে পারে একথা মনেই আসেনি।'

সত্যবতী বলিল, 'না, গোড়া থেকে বল।'

২রা জানুয়ারী। কলিকাতায় ফিরিয়া চলিয়াছি। ডি.এস.পি পাণ্ডে, মহীধরবাবু ও রজনী স্টেশনে আসিয়া আমাদের গাড়িতে তুলিয়া দিয়া গিয়াছেন। এতক্ষণে আমরা নিশ্চিন্ত মনে একত্র হইতে পারিয়াছি।

ব্যোমকেশ বলিল, 'দুটো জিনিস জট পাকিয়ে গিয়েছিল—এক, ছবি চুরি; দ্বিতীয়, ডাক্তার আর রজনীর গুপ্ত প্রণয়। ওদের প্রণয় গুপ্ত হলেও তাতে নিন্দের কিছু ছিল না। ওরা কলকাতায় গিয়ে রেজিস্ট্রি করে বিয়ে করেছে। সম্ভবতঃ রজনীর মাসী আর মেসো জানেন, আর কেউ জানে না; মহীধরবাবুও না। তিনি যতদিন বেঁচে থাকবেন, ততদিন কেউ জানবে না। মহীধরবাবু সেকেলে লোক নয়, তবু বিধবা-বিবাহ সম্বন্ধে সাবেক সংস্কার ত্যাগ করতে পারেননি। তাই ওরা লুকিয়ে বিয়ে করে সব দিক রক্ষে করেছে।'

জিজ্ঞাসা করিলাম, 'খবরটা কি ডাক্তারের কাছে পেলে?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'উঁহু। ডাক্তারকে ঘাঁটাইনি, ও যে রকম রুখে ছিল, কিছু বলতে গেলেই কামড়ে দিত। আমি রজনীকে আড়ালে বলেছিলাম, সব জানি। সে জিজ্ঞেস করেছিল, ব্যোমকেশবাবু, আমরা কি অন্যায় করেছি? আমি বলেছিলাম—না। তোমরা যে বিদ্রোহের ঝোঁকে মহীধরবাবুকে দুঃখ দাওনি, এতেই তোমাদের গৌরব। উগ্র বিদ্রোহে বেশী কাজ হয় না, কেবল বিরুদ্ধ শক্তিকে জাগিয়ে তোলা হয়। বিদ্রোহের সঙ্গে সহিষ্ণুতা চাই। তোমরা সুখী হবে।'

সত্যবতী বলিল, 'তারপর বল।'

ব্যোমকেশ বলিতে আরম্ভ করিল, 'ছবি চুরির ব্যাপারটাকে যদি হাল্কা ভাবে নাও তাহলে তার অনেক রকম ব্যাখ্যা হতে পারে। কিন্তু যদি গুরুতর ব্যাপার মনে কর, তাহলে তার একটিমাত্র ব্যাখ্যা হয়—ঐ গ্রুপের মধ্যে এমন একজন আছে যে নিজের চেহারা লোকচক্ষুর আড়ালে রাখতে চায়।

'কিন্তু কি উদ্দেশ্যে?—একটা উদ্দেশ্য এই হতে পারে যে ঐ দলে একজন দাগী আসামী আছে যে নিজের ছবির প্রচার চায় না। প্রস্তাবটা কিন্তু টেকসই নয়। ঐ গ্রুপে যারা আছে তারা কেউ লুকিয়ে বেড়ায় না, তাদের সকলেই চেনে। সুতরাং ছবি চুরি করার কোনও মানে হয় না।

'দাগী আসামীর সম্ভাবনা ত্যাগ করতে হচ্ছে। কিন্তু যদি ঐ দলে এমন কেউ থাকে যে ভবিষ্যতে দাগী আসামী হবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে, অর্থাৎ একটা গুরুতর অপরাধ করে কেটে পড়বার চেষ্টায় আছে, তাহলে সে নিজের ছবি লোপাট করবার চেষ্টা করবে। অজিত, তুমি তো লেখক, শুধু ভাষায় দ্বারা একটা লোকের এমন হুবহু বর্ণনা দিতে পার যাতে তাকে দেখলেই চেনা যায়?—পারবে না; বিশেষতঃ তার চেহারা যদি মামুলী হয় তাহলে একেবারেই পারবে না। কিন্তু একটা ফটোগ্রাফ মুহূর্তমধ্যে তার চেহারাখানা আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরতে পারে। তাই দাগী আসামীদের ফটো পুলিসের ফাইলে রাখা থাকে।

'তাহলে পাওয়া গেল, ঐ দলের একটা লোক গুরুতর অপরাধ করে ডুব মারবার ফন্দি আঁটছে। এখন প্রশ্ন এই—সংকল্পিত অপরাধটা কি এবং লোকটা কে?

'গ্রুপের লোকগুলিকে একে একে ধরা যাক।—মহীধরবাবু ডুব মারবেন না; তাঁর বিপুল সম্পত্তি আছে, চেহারাখানাও ডুব মারবার অনুকূল নয়। ডাক্তার ঘটক রজনীকে নিয়ে উধাও হতে পারে কিন্তু রজনী সাবালিকা, তাকে নিয়ে পালানো আইন-ঘটিত অপরাধ নয়। তবে ছবি চুরি করতে যাবে কেন? অধ্যাপক সোমকেও বাদ দিতে পার। সোম যদি শিকল কেটে ওড়বার সংকল্প করতেন তা হলেও স্রেফ ঐ ছবিটা চুরি করার কোনও মানে হত না। সোমের আরও ছবি আছে; নকুলেশবাবুর ঘরে তাঁর ফটো টাঙানো আছে আমরা দেখেছি। তারপর ধর নকুলেশবাবু; তিনি পিকনিকের দলে ছিলেন। তিনি মহীধরবাবুর কাছে মোটা টাকা ধার করেছিলেন, সুতরাং তাঁর পক্ষে গা-ঢাকা দেওয়া অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু তিনি ফটো তুলেছিলেন, ফটোতে তাঁর চেহারা ছিল না। অতএব তাঁর পক্ষে ফটো চুরি করতে যাওয়া বোকামি।

'বাকি রয়ে গেলেন ডেপুটি ঊষানাথবাবু এবং ব্যাঙ্ক-ম্যানেজার অমরেশ রাহা। একজন সরকারী মালখানার মালিক, অন্যজন ব্যাঙ্কের কর্তা। দেখা যাচ্ছে, ফেরার হয়ে যদি কারুর লাভ থাকে তো এ'দের দু'জনের। দু'জনের হাতেই বিস্তর পরের টাকা; দু'জনেই চিনির বলদ।

'প্রথমে ঊষানাথবাবুকে ধর। তাঁর স্ত্রী-পুত্র আছে; চেহারাখানাও এমন যে ফটো না থাকলেও তাঁকে সনাক্ত করা চলে। তিনি চোখে কালো চশমা পরেন, চশমা খুললে দেখা যায় তাঁর একটা চোখ কানা। বেশীদিন পুলিসের সন্ধানী চক্ষু এড়িয়ে থাকা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। তাছাড়া, তাঁর চরিত্রও এমন একটা দুঃসাহসিক কাজ করার প্রতিকূল।

'বাকি রইলেন অমরেশ রাহা। এটা অবশ্য নেতি প্রমাণ। কিন্তু তারপর তাঁকে ভাল করে লক্ষ্য করলে দেখবে তিনি ছাড়া আর কেউ হতে পারেন না। তাঁর চেহারা নিতান্ত সাধারণ, তাঁর মত লক্ষ লক্ষ বৈশিষ্ট্যহীন লোক পৃথিবীতে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তিনি মুখে ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি রেখেছেন। এ রকম দাড়ি রাখার সুবিধে, দাড়ি কামিয়ে ফেললেই চেহারা বদলে যায়, তখন চেনা লোক আর চিনতে পারে না। নকল দাড়ি পরার চেয়ে তাই আসল দাড়ি কামিয়ে ফেলা ছদ্মবেশ হিসেবে ঢের বেশী নিরাপদ এবং নির্ভরযোগ্য।

'অমরেশবাবু অবিবাহিত ছিলেন। তিনি মাইনে ভালই পেতেন, তবু তাঁর মনে দারিদ্র্যের

ক্ষোভ ছিল; টাকার প্রতি দুর্দম আকাঙ্ক্ষা জন্মেছিল। আমার মনে হয় তিনি অনেকদিন ধরে এই কু-মতলব আঁটছিলেন। তাঁর আলমারিতে গুজরাটী বই দেখেছিলে মনে আছে? তিনি চেষ্টা করে গুজরাটী ভাষা শিখেছিলেন; হয়তো সংকল্প ছিল টাকা নিয়ে বোম্বাই অঞ্চলে গিয়ে বসবেন। বাঙালীদের সঙ্গে গুজরাটীদের চেহারার একটা ধাতুগত ঐক্য আছে, ভাষাটাও রপ্ত থাকলে কেউ তাঁকে সন্দেহ করতে পারবে না।

'সবদিক ভেবে আঁটঘাট বেঁধে তিনি তৈরী হয়েছিলেন। তারপর যখন সংকল্পকে কাজে পরিণত করবার সময় হল তখন হঠাৎ কতকগুলো অপ্রত্যাশিত বাধা উপস্থিত হল। পিক্‌নিকের দলে গিয়ে তাঁকে ছবি তোলাতে হল। তিনি অনিচ্ছাভাবে ছবি তুলিয়েছিলেন সন্দেহ নেই, কিন্তু না তোলাতে লোকের মনে সন্দেহ জাগতে পারে। ভাবলেন, ছবি চুরি করে সামলে নেবেন।

'যাহোক, তিনি মহীধরবাবুর বাড়ি থেকে ছবি চুরি করলেন। পরদিন চায়ের পার্টিতে আমরা উপস্থিত ছিলাম; সেখানে যে সব আলোচনা হল তাতে অমরেশবাবু বুঝলেন তিনি একটা ভুল করেছেন। স্রেফ ছবিখানা চুরি করা ঠিক হয়নি। তাই পরের বার যখন তিনি ঊষানাথবাবুর বাড়িতে চুরি করতে গেলেন তখন আর কিছু না পেয়ে পরী চুরি করে আনলেন। আলমারিতে চাবি ঢুকিয়ে এমন একটা পরিস্থিতির সৃষ্টি করলেন যাতে মনে হয় ছবি চুরি করাটা চোরের মূল উদ্দেশ্য নয়। অধ্যাপক সোমের ছবিটা চুরি করার দরকার হয়নি। আমার বিশ্বাস তিনি কোনও উপায়ে জানতে পেরেছিলেন যে, মালতী দেবী ছবিটা আগেই ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছেন। কিংবা এমনও হতে পারে যে, তিনি ছবি চুরি করতে গিয়েছিলেন কিন্তু ছবি তার আগেই নষ্ট করা হয়েছিল। হয়তো তিনি ছেঁড়া ছবির টুকরোগুলো পেয়েছিলেন।

'আমার আবির্ভাবে অমরেশবাবু শঙ্কিত হননি। তাঁর মূল অপরাধ তখনও ভবিষ্যতের গর্ভে; তিনি টাকা নিয়ে উধাও হবার পর সবাই জানতে পারবে, তখন আমি জানলেও ক্ষতি নেই। কিন্তু ফাল্গুনী পালের প্রেতমূর্তি যখন এসে দাঁড়াল, তখন অমরেশবাবু মাথায় হাত দিয়ে বসলেন। তাঁর সমস্ত প্ল্যান ভেস্তে যাবার উপক্রম হল। ফাল্গুনী থাকতে ফটো চুরি করে কি লাভ? সে স্মৃতি থেকে ছবি এঁকে ফটোর অভাব পূরণ করে দেবে।

'কিন্তু পরকীয়া-প্রীতির মত বেআইনী কাজ করার একটা তীব্র উত্তেজনা আছে। অমরেশবাবু তার স্বাদ পেয়েছিলেন। তিনি এতদূর এগিয়ে আর পেছুতে পারছিলেন না। তাই ফাল্গুনী যেদিন তাঁর ছবি এঁকে দেখাতে এল সেদিন তিনি ঠিক করলেন ফাল্গুনীর বেঁচে থাকা চলবে না। সেই রাত্রে তিনি মদের বোতলে বেশ খানিকটা আফিম মিশিয়ে নিয়ে ফাল্গুনীর কুঁড়ে ঘরে গেলেন। ফাল্গুনীকে নেশার জিনিস খাওয়ানো শক্ত হল না। তারপর সে যখন অজ্ঞান হয়ে পড়ল তখন তাকে তুলে কুয়োয় ফেলে দিলেন। আগের রাত্রে চুরি-করা পরীটা তিনি সঙ্গে এনেছিলেন, সেটাও কুয়োর মধ্যে গেল; যাতে পুলিস ফাল্গুনীকেই চোর বলে মনে করে। এই ব্যাপার ঘটেছিল সম্ভবতঃ রাত্রি এগারোটার পর, যখন বাগানের অন্য কোণে আর একটি মন্ত্রণা সভা শেষ হয়ে গেছে।

'পোস্ট-মর্টেম রিপোর্ট থেকে মনে হয় ফাল্গুনী জলে পড়বার আগেই মরে গিয়েছিল। কিন্তু অমরেশবাবুর বোধ হয় ইচ্ছে ছিল সে বেঁচে থাকতে থাকতেই তাকে জলে ফেলে দেন, যাতে প্রমাণ হয় সে নেশার ঝোঁকে অপঘাতে জলে ডুবে মরেছে।

'যাহোক, অমরেশবাবু নিষ্কণ্টক হলেন। যে ছবিটা তিনি আমাদের দেখিয়েছিলেন, রওনা দেবার আগে সেটা পুড়িয়ে ফেললেই নিশ্চিন্ত, আর তাঁকে সনাক্ত করবার কোনও চিহ্ন থাকবে না।

'আমি যখন নিঃসংশয়ে বুঝতে পারলাম এ অমরেশবাবুর কাজ, তখন পাণ্ডে সাহেবকে সব কথা বললাম। ভারি বুদ্ধিমান লোক, চট করে ব্যাপার বুঝে নিলেন। সেই থেকে এক মিনিটের জন্যেও অমরেশবাবু পুলিসের চোখের আড়াল হতে পারেননি।'

ব্যোমকেশ সিগারেট ধরাইল।

আমি বলিলাম, 'আচ্ছা, অমরেশ রাহা যে ঠিক ঐ দিনই পালাবে, এটা বুঝলে কি করে? অন্য যে কোনও দিন পালাতে পারত।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'একটা কোনও ছুটির আগে পালানোর সুবিধে আছে, দু'দিন সময় পাওয়া যায়। দু'দিন পরে ব্যাঙ্ক খুললে যখন চুরি ধরা পড়বে, চোর তখন অনেক দূরে। অবশ্য বড়দিনের ছুটিতেও পালাতে পারত; কিন্তু তার দিক থেকে নববর্ষের ছুটিতেই পালানোর দরকার ছিল। অমরেশ রাহা যে-ব্যাঙ্কের ম্যানেজার ছিল সেটা কলকাতার একটা বড় ব্যাঙ্কের ব্রাঞ্চ অফিস। প্রত্যেক মাসের শেষে এখানে হেড আপিস থেকে মোটা টাকা আসত; কারণ পরের মাসের আরম্ভেই ব্যাঙ্কের টাকায় টান পড়বে। সাধারণ লোক ছাড়াও এখানে কয়েকটা খনি আছে, তাতে অনেক কর্মী কাজ করে, মাসের পয়লা তাদের মাইনে দিতে হয়। এবার সেই মোটা টাকাটা ব্যাঙ্কে এসেছিল বড়দিনের ছুটির পর। বড়দিনের ছুটির আগে পালালে অমরেশ রাহা বেশী টাকা নিয়ে যেতে পারত না। তার দুটি সুটকেশ থেকে এক লাখ আশী হাজার টাকার নোট পাওয়া গেছে।'

ব্যোমকেশ লম্বা হইয়া শুইল, বলিল, 'আর কোনও প্রশ্ন আছে?'

'দাড়ি কামালো কখন? ট্রেনে?'

'হ্যাঁ। সেইজন্যেই ফার্স্ট ক্লাসের টিকিট কিনেছিল। ফার্স্ট ক্লাসে সহযাত্রীর সম্ভাবনা কম।'

সত্যবতী বলিল, 'মহীধরবাবুকে বেনামী চিঠি কে দিয়েছিল?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'প্রোফেসর সোম। কিন্তু বেচারার প্রতি অবিচার কোরো না। লোকটি শিক্ষিত এবং সজ্জন, এক ভয়ঙ্করী স্ত্রীলোকের হাতে পড়ে তাঁর জীবনটা নষ্ট হতে বসেছে। সোম সংসারের জ্বালায় অতিষ্ঠ হয়ে রজনীর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। কিন্তু সেদিকেও কিছু হল না, ডাক্তার ঘটকের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তিনি হেরে গেলেন। তাই ঈর্ষার জ্বালায়—। ঈর্ষার মতন এমন নীচ প্রবৃত্তি আর নেই। কাম ক্রোধ লোভ—ষড়রিপুর মধ্যে সবচেয়ে অধম হচ্ছে মাৎসর্য।' একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, 'মালতী দেবীর অসুখের খুবই বাড়াবাড়ি যাচ্ছে। কারুর মৃত্যু-কামনা করতে নেই, কিন্তু মালতী দেবী যদি সিঁথেয় সিঁদুর নিয়ে এই বেলা স্বর্গারোহণ করেন তাহলে অন্তত আমি অসুখী হব না।'

আমিও মনে মনে সায় দিলাম।